আমাজনের জঙ্গলে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী




আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

আমাজনের জঙ্গলে

আমাজনের জঙ্গলে

অমরেন্দ্র চ. বর্তী

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

AMAZONER JANGOLE
A novelet for children by
Amarendra Chakravorty

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
যুধাজিৎ .সনগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০১
(২,১০০ কপি)

দ্বিতীয় সংস্করণ
অক্টোবর ২০০২
(৩,০০০ কপি)

তৃতীয় মুদ্রণ
মে ২০০৩
(৩,০০০ কপি)

চতুর্থ মুদ্রণ
কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০৫
(৩,১০০ কপি)

পঞ্চম মুদ্রণ
আগস্ট ২০০৬
(৩,০০০ কপি)

ষষ্ঠ মুদ্রণ
নভেম্বর ২০০৯
(৩,০০০ কপি)

ISBN 81-86891-29-3

প্রকাশক
সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মহাশ্বেতা-সিদ্ধার্থকে

লেখকের অন্যান্য ছোটদের বই

হীরু ডাকাত

শাদা ঘোড়া

ঋষিকুমার

গৌর যাযাবর

পাখির খাতা

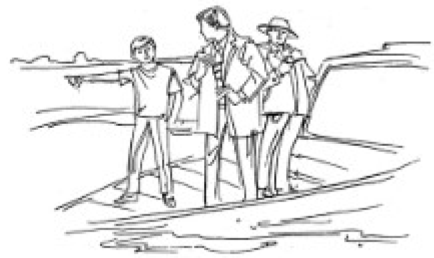
আমার বনবাস

তালগাছের ডোঙা

হরিণের সঙ্গে খেলা

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

সূচি



১

আমরা নিগ্রো নদী .বয়ে আমাজন নদীর দিকে চলেছি । নিগ্রো নদীর জল এত কালো যে মনে হয় নদীর তীরে কোথাও হয়তো কয়লাখনি আছে! সত্যিই আছে নাকি? কাকাকে সেকথা জিজ্ঞেস করতে তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘ইন্ডিয়ায় আজকাল এইরকম লেখাপড়া হচ্ছে বুঝি!’

কাকা তাঁর পর্তুগিজ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলায় বাধা পেয়েই হয়তো বিরক্ত হয়েছেন, মানাউসে মোটরবোটে উঠে থেকে দুজনে শুধু কথাই বলে যাচ্ছেন, নদীর রং, নদী তীরের রূপ একবারের জন্যও দেখছেন না । কী নিয়ে এত কথা জানি না, তাঁরা কথা বলছেন পর্তুগিজ ভাষায় । আমি ব্রাজিলে এসেছি মাত্র দুদিন, দুদিনে দুটো মাত্র পর্তুগিজ শব্দ শিখেছি— বনদিয়া, মানে গুড ডে অর্থাৎ শুভ দিন, ওব্রিগাদো, মানে থ্যাঙ্ক ইউ, ধন্যবাদ ।

কাকা এদেশে আছেন প্রায় দশ-বারো বছর । এখানকার আন্দিজ পাহাড়ে নাকি নানা রকম রঙিন পাথর পাওয়া যায় । শুনেছি সেইসব রঙিন পাথরের ব্যবসা আছে তাঁর ।

কাকা থাকেন রিও ডি জেনেরোয় । সেখানে সমুদ্রের কাছে তাঁর মস্ত বাড়ি । বাড়িতে কিন্তু কাকিমা বা তাঁদের কোনও ছেলেমেয়েকে দেখলাম না । কাকিমাকে আমি একবারই দেখেছি, কানে ঝুমকো, নাকে নোলক, মাথায় মুকুট পরা নতুন বউয়ের সাজে, কাকার বউভাতের দিন । বিয়ে হয়েছিল নদীয়া জেলার পলাশীতে, কাকা সেখানেই তখন কীসব ব্যবসাট্যাবসা করতেন । আমি মায়ের কোলে চড়ে কাকার বিয়েতে গিয়েছিলাম ।

বড় হয়ে স্কুলে ইতিহাসের বইয়ে পড়েছি ওই পলাশীর আমবাগানে বাংলার নবাব সিরাজদৌলাকে যুদ্ধে হারিয়ে ইংরেজরা ক্রমশ আমাদের দেশের শাসক হয়ে বসে ।

আর দুবছর পরেই আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা । কাকা-কাকিমার সঙ্গে সেই যে পলাশীতে একবার দেখা হয়েছিল, তারপর আর কোনওদিন দেখিনি তাঁদের । এবার ব্রাজিলে এসেছি কাকা এখানে আছেন বলেই । সারা পৃথিবীর মধ্যে চিঠি লেখা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে আমি একটা রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড টিকিট পুরস্কার পেয়েছি । এই টিকিটে কলকাতা থেকে

ব্যাংকক, হংকং, টোকিও, লস এঞ্জেলেস, নিউইয়র্ক, রিও ডি জেনেরো, কোপেনহেগেন, দিল্লি হয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসা যাবে ।

পৃথিবীটা এক চক্কর ঘুরে আসতে প্লেনের টিকিটের জন্য পয়সা লাগছে না ঠিকই, কিন্তু ব্যাংকক, হংকং, টোকিও, নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস —এইসব জায়গায় থাকা-খাওয়া ঘোরাঘুরি তো আর বিনাপয়সায় হয় না । একমাত্র ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোয় কাকার বাড়ি আছে বলে টিকিটটা খানিকটা কাজে লাগাতে পারছি । বাবা সেইমতো আমার এই পুরস্কারের কথা কাকাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, উত্তরে কাকা লিখেছিলেন— ঠিক করে কোন এয়ারলাইন্সে আসছি জানালে তিনি এয়ারপোর্টে আমাকে নিতে আসবেন । আসলে সারা পৃথিবীর দেড়শোটি দেশের স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমিই এই চিঠি লেখা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছি বলে বাবার একটু গর্বই হয়েছিল । কাকাকেও পুরস্কারের কথাটা একটু লম্বা করেই লিখেছিলেন ।

পুরস্কার পেয়ে কার না আনন্দ হয়! বিশেষ করে প্রায় সারা পৃথিবী ঘোরার প্লেনের টিকিট পেলে মন তো নাচবেই । তাছাড়া রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড কথাটা শুনেই আমার জুল ভের্নের 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ' বইটার কথা মনে পড়েছিল । আমিও যদি ৮০ দিনে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে আসতে পারতাম! দেশে দেশে আমার কত বন্ধু হত তাহলে!

প্রতিযোগিতাটাও ছিল এই নতুন দেশ দেখা নিয়ে চিঠি লেখার । বিদেশের কোনও বন্ধুকে তোমার দেশ বেড়িয়ে যাবার নিমন্ত্রণ করে চিঠি লিখতে হবে । তাতেই আমি ফার্স্ট হই । পৃথিবী ঘুরে আসার প্লেনের টিকিট পাই । কিন্তু পৃথিবী দূরের কথা, কাকা না থাকলে আমার একটা দেশেও যাওয়া হত না ।

রিও ডি জেনেরোয় কাকা সারাদিন তাঁর ব্যবসার কাজেই ব্যস্ত থাকেন, তাই প্রথম দুদিন আমি একাই শুধু সমুদ্রতীরে ঘুরলাম ।



তৃতীয় দিনও সমুদ্রতীর ধরে অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে এলাম । সমুদ্রতীর ধরে ঘুরলে রাস্তা হারাবার ভয় থাকে না, তাছাড়া সমুদ্র আমার খুব ভালো লাগে ।

সেদিনই রাতে খাবার টেবিলে কাকা হঠাৎ বললেন, 'আমাজনের জঙ্গলে যেতে চাও? তাহলে কাল সকাল সাতটায় এয়ারপোর্ট যাবার জন্য তৈরি থেকো ।'

রিও ডি জেনেরো থেকে প্লেন প্রথমে এল ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাজিলিয়ায় । সেখান থেকে এক ঘণ্টা পর প্লেন আবার আকাশে উড়ল, এবার আর কোথাও না থেমে সোজা নামল মানাউসে । মানাউস আমাজন রাজ্যের রাজধানী । এখানেই এয়ারপোর্টে কাকার পর্তুগিজ বন্ধু গাড়ি নিয়ে কাকার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেই গাড়িতে মানাউস জেটিতে এসে আমরা মোটরবোটে উঠেছি ।

নিগ্রো নদী থেকে একটু দূরে বাঁদিকে একটা নদী চোখে পড়ল । তার জল অনেকটা যেন হলদে রঙের । অথবা হয়তো যেন বাদামি । এত দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না ।

নতুন নদী দেখলে তার নাম না জানলে আমার ভালো লাগে না । কাকারা তখনও কথায় ব্যস্ত, তবু আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না— 'কাকা, ওই নদীটা দ্যাখো, জলের রংটা একেবারে অন্যরকম, কী নদী ওটা?'

কাকা এবার আর তত বিরক্ত হলেন না, বললেন, 'ওটা হল সোলিময়েস— হলুদ জলের নদী । নিগ্রোর মতো এও আমাজন নদীতে গিয়ে পড়েছে । আমাজনের বাঁ তীরে আর ডান তীরে এরকম প্রায় হাজার-বারোশো উপনদী আছে । সবাই আমাজনে গিয়ে মিশেছে ।'

কাকার বন্ধু যেমন কাকাকে ডাকছে বারীন বলে, কাকাও তেমনই তাঁর বন্ধুকে নাম ধরে ডাকছেন । এঁর নাম গঞ্জালো ।

এঁরা কেন আমাজনের জঙ্গলে যাচ্ছেন, আমাকেই বা কেন নিয়ে যাচ্ছেন, আমি কিছুই জানি না । মনে হয়, ওঁরা কোনও কাজে যাচ্ছেন, আর কাকা আমাকে আর কোথায় রেখে আসবেন, তাই সঙ্গে নিয়েছেন ।

আরও প্রায় দু-ঘণ্টা পর আমরা আমাজন নদীতে পড়লাম । এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম, কালো জলের নদী নিগ্রো আর হলুদ জলের নদী সোলিময়েস আমাজনে পড়েও কালো আর হলুদ রঙের নদী হয়েই রয়েছে । বেশ কিছু দূর পর্যন্ত জলের এইরকম আলাদা দুটো রং দেখা গেল ।

আমাজন নদী এত বড় যে চেয়ে থাকতে থাকতে ভয় ধরে যায় । হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত দীর্ঘ আমাদের গঙ্গা নদীর চেয়ে আমাজন দ্বিগুণ না কি তিনগুণেরও বেশি বড় । কাকা বললেন মোহনার কাছে নদীটা চারশো কিলোমিটার চওড়া! আমাজনের বিশাল জঙ্গলে এত বড় নদীতে মোটরবোটে আমরা মাত্র চারটি প্রাণী । কাকা, কাকার বন্ধু গঞ্জালো, আমি, আর যে বোট চালাচ্ছে সে ।

বোট ক্রমশ মাঝনদী ছেড়ে তীরের দিকে এগোতে লাগল। একটু পরেই আমরা নদীর প্রায় তীর ঘেঁসে চলতে লাগলাম। নদীর তীরে বিরাট বিরাট গাছের বিশাল জঙ্গল, কোথাও তার শেষ দেখা যায় না।

আমাজনের নদীতে রোদ এত কড়া যে গা পুড়ে যায়। এখন তীরের কাছে জঙ্গলের ঘন ছায়া পেয়ে বাঁচলাম। কলকাতা থেকে কত হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর ঠিক কোন জায়গায় আছি ভাবতে ভাবতে ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে, তবু, কেন জানি না, ঠিক করলাম, কিছুতেই ঘুমব না।





২

এককেটা গাছ এখানে এত লম্বা যে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে না গিয়ে কী করে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে! গাছ থেকে মস্ত মস্ত ঝুরি নেমে এসেছে নদীর জল পর্যন্ত ।

হঠাৎ দেখি মোটাসোটা মস্ত একটা হনুমান গাছের একটা ঝুরি শুধু লেজ দিয়ে আঁকড়ে ধরে খুব জোরে জোরে দোল খাচ্ছে । একেকবার বোটের প্রায় মাথা পর্যন্ত চলে আসছে দেখে আমার গায়ে কাঁটা দেয় । বোটে নেমে পড়বে নাকি!

কাকা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'ভয় পেয়ো না, এদের বলে উলি মাঙ্কি । উলের পুরু কম্বলের মতো গায়ের লোম ।'

কাকার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হনুমানটা হঠাৎ ঝুরি ছেড়ে আমাদের বোটের ওপর লাফিয়ে নামল । কেউ কিছু বোঝবার আগেই আরেক লাফে কাকার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুহাতের হ্যাঁচকা টানে কাকার কোল থেকে তাঁর ব্যাগটা নিয়ে প্রথমে বোটের ছাদে উঠে গেল, সেখান থেকে আরেক লাফে একটা মস্ত ঝুরিতে ঝুলে পড়ল ।

পরপর চার-পাঁচটা গুলির শব্দে চমকে উঠে দেখলাম কাকা ও গঞ্জালো দুজনের হাতেই রাইফেল । রাইফেলের গুলি হনুমানটার গায়ে লাগেনি । দুজনেই তখনও গুলি ছুড়ে চলেছেন । হনুমানটাও ততক্ষণে বিদ্যুৎ গতিতে এক ঝুরি থেকে আরেক ঝুরিতে লাফিয়ে, এক গাছ থেকে আরেক গাছে চড়ে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল ।

গঞ্জালোর চোখ দিয়ে আগুন বেরচ্ছে, কাকা রাইফেল হাতেই বুক চাপড়ে হা হা করে কেঁদে উঠলেন । গলা চিরে এই প্রথম বাংলায় বলে উঠলেন, 'ওরে আমার সর্বস্ব গেল রে!'

ছোট একটা ব্যাগে কী করে মানুষের সর্বস্ব থাকে আমি জানি না । আমার সবচেয়ে প্রিয় পঁচিশটা গল্পের বইও ওতে ধরবে না! ব্যাগটা চামড়ার, বেশ পুরনো, তবে তিন-চার

ইঞ্চি লম্বা তালাটা খুব চকচক করছিল মনে আছে । ব্যাগে কাকার সবকিছু ছিল বলেই হয়তো অত বড় তালা!

গঞ্জালো কাকাকে পর্তুগিজ ভাষায় খুব উত্তেজিত স্বরে কিছু বললেন, কাকাও এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, 'আমরা জঙ্গলে ঢুকছি, বোট এখানেই থাকবে, যত তাড়াতাড়ি পারি ব্যাগটা নিয়ে ফিরে আসব ।'

বোটের চালককেও সেইমতো কিছু বললেন । নদীর ধার ঘেঁসে যাবার সময়ই বোটের গতি বোধহয় প্রায় অর্ধেক কমানো হয়েছিল, এখন আরও আস্তে চালিয়ে চালক বেশ কৌশল করে বোটের একটা মুখ তীরের আরও কাছে নিয়ে গিয়ে বোট থামাল । তারপর বড় একটা তক্তা পেতে দিল, তার এক মাথা বোটে, আরেক মাথা নদীর পাড়ের জঙ্গলে । কাকা আর গঞ্জালো শুধু রাইফেল নিয়ে প্রায় দৌড়ে নেমে গেলেন, এক মিনিট পরে অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের কাউকেই আর দেখতে পেলাম না ।

তক্তা পাতাই রইল । বোটে শুধু আমি আর চালক (ওর নামটা পর্যন্ত এখনও জানি না) । চোখের সামনে শুধু সীমাহীন ঘন জঙ্গল । 'ভ্রমণ' পত্রিকায় পড়েছিলাম দক্ষিণ আমেরিকার ন'টা দেশে ষাট লক্ষ বর্গকিলোমিটার জুড়ে এই আমাজন । এর গভীরে এখনও এমন অনেক আদিম মানুষ আছে কেউ যাদের কোনওদিন চোখেও দেখেনি, যারা নিজেরাও তাদের আদিম অরণ্যের বাইরে আমাদের এই পৃথিবীর কথা, সভ্য মানুষ জাতির কথা কিছুই জানে না!

কয়েক ঘণ্টা আগে ভীষণ রোদ্দুরে নদী ঝকঝক করছিল, এখন আকাশে জলে আশ্চর্য রং ছড়িয়ে আমাজন নদীতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এমন সূর্যাস্ত আমি কোথাও কখনও দেখিনি, কিন্তু বুক যখন ভয়ে ঢিবঢিব করে তখন সাত রঙের খেলাও চোখের মধ্যে দিয়ে মনের মধ্যে ঢুকতে চায় না । আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে, নদীর জল অন্ধকার হয়ে আসছে, সামনের জঙ্গল যেন একটা জমাট বাঁধা অন্ধকার, এমন আগাগোড়া অন্ধকারে কাকারা পথ চিনে বোটে ফিরে আসবে কী করে, কখন ফিরবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না । জঙ্গলে নেমে যাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত একবারও তাঁদের রাইফেলের শব্দও শুনিনি ।



এদিকে বোটের চালকের ভাষাও জানি না, সারাদিনে তাকে একবারই কথা বলতে শুনেছি, কাকারা নেমে যাবার সময়, তার ভাষাও মনে হয় পর্তুগিজ।

আমি আর চুপ করে থাকতে না পেরে আমাদের ক্লাসের ইংরিজি বইয়ের মতো খুব সরল ইংরিজিতে বললাম, 'কাকাদের এত দেরি হচ্ছে কেন? আপনি কি কিছু অনুমান করতে পারছেন?'

লোকটা কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? ঘুম ভাঙা গলায় থেমে থেমে বলল, 'রিপিত, অ্যান্দ স্পিক লিতিল স্লোলি' (আবার বলো, আর একটু ধীরে ধীরে বলো)।

আমিও থেমে থেমে কথাটা আবার বললাম।

লোকটা এবারে তার অদ্ভুত উচ্চারণে যা বলল, তার মানে হল— আমাজনের জঙ্গলে যে কেউ যেতে পারে, ফিরতে প্রায় কেউই পারে না। তবে ওই দুজনের একজন, যার নাম গঞ্জালো, সে খুব ওস্তাদ লোক, সে পথ চিনতে পারবে মনে হয়। কিন্তু হনুমানের কাছ থেকে ব্যাগ ফেরৎ না পেলে তারা ফিরবে কি না তা শুধু বোতোই জানে!

'বোতো কে?'

'আমাজনে এসেছ আর জিজ্ঞেস করছ, বোতো কে? বোতো ভারমেলোর কথা তুমি শোনোনি?'

লোকটার গলার স্বরে কিছুটা রাগ আর বিরক্তি। আমি খুব বিনীতভাবে থেমে থেমে তাকে বোঝালাম যে আমি তো আজই প্রথম আমাজনে এসেছি, বোতো ভারমেলোর কথা তাই এখনও জানা হয়নি, তুমি আমাকে বলো।

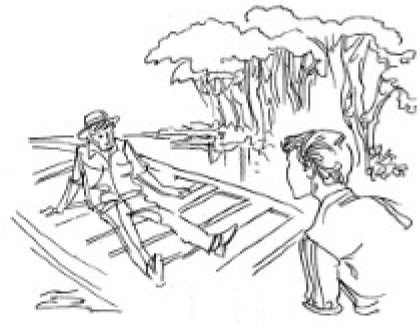
বোটে কি আলো জ্বলে না নাকি? অন্ধকারে লোকটার গলা শুনতে পেলাম— বোতোই এই আমাজন রাজ্যের রাজা, আমাজন নদীর নিচে সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে তার ঝকঝকে বিরাট শহর। নানা রঙের পাথরে তৈরি মস্ত রাজপ্রাসাদ। বোতোর ব্রেন মানুষের ব্রেনের চেয়ে অনেক বড়। এদের বুদ্ধি, দয়া-মায়া, সাঁতারের ক্ষমতা সবই মানুষের চেয়ে বেশি। রহস্যময় আমাজনের কথা শুধু এরাই জানে। আজকালকার সাহেবরা দু-চার দিনে আমাজনে ঘুরে বলে বেড়ায়— বোতো নাকি অনেকটা ডলফিনের মতো একটা প্রাণী, আমাদের লাল বোতোর রংও নাকি লাল নয়, গোলাপি! আমাজন একটা আলাদা জগৎ, বাইরের জগতের লোকেরা তার কীই বা জানতে পারে!

কাকা এখনও ফিরল না, আমার সেই বিপদ দেখে অথবা বোতোর কথা বলতে পেরে, যে কোনও কারণেই হোক লোকটার মনে একটু দয়া হয়েছে মনে হল। এবার বেশ নরম গলায় বলল, 'তোমরা অন্য পৃথিবীর লোক, শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবে না, আমাজনের জঙ্গলে, দ্বীপে, নদীতীরে, এমনকী নদীর বুকে যারা ঘর বেঁধে থাকে, তাদের অনেকেই

তাদের ছেলে বা মেয়েকে দেখিয়ে বলে— এটা বোতোর ছেলে, এটা বোতোর মেয়ে । আমাজনে তুমি বোতোর গল্প শুনে শেষ করতে পারবে না ।’

এই গাঁজাখুরি গল্প কেই বা এখন শুনতে চায়! তবে জলের নিচে রঙিন পাথরের রাজপ্রাসাদ শুনে ভাবনা হল, কাকারা ডুবুরি নামিয়ে অথবা নিজেরাই ডুবুরির মতো নিচে নেমে নদীগর্ভ থেকে রঙিন পাথর নেবার জন্য আমাজনে আসেনি তো? কাকার তো রঙিন পাথরেরই ব্যবসা! পর মুহূর্তেই মনে হল, এ অসম্ভব! কাকাদের মতো শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষ নিশ্চয়ই নদীগর্ভে বোতোর রাজপ্রাসাদের গল্পে বিশ্বাস করবে না ।





৩

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, ঘুম ভাঙতেই দেখি সকালের রোদ্দুরে আমাজন নদী জ্বলছে । বোটচালক লোকটা লম্বা হয়ে শুয়ে তখনও ঘুমোচ্ছে । তার পাশে একটা স্যান্ডউইচের খালি প্যাকেট আর একটা কোকাকোলার খোলা টিন পড়ে আছে । কাকারা কেউ ফেরেনি!

যেদিকেই চাই হয় জল, নয় জঙ্গল, জল আর জঙ্গল ছাড়া কোথাও কিছু নেই । এ যেন আমাদের পৃথিবীর একেবারে বাইরে, শুধু জল-জঙ্গলের একটা আলাদা জগৎ ।

কী করব, কোথায় যাব, কাকাদের খোঁজ করবই বা কীভাবে কিছুই ভেবে পাচ্ছি না । পৃথিবী ঘোরার প্লেনের টিকিট পেয়ে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল ।

এদিকে খিদেয় গা গুলোচ্ছে । কাকাদের খাবারের ব্যাগ থেকে বিস্কুট বের করতে গেলাম, সেই শব্দে লোকটার ঘুম ভেঙে গেল । বোটের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেশ বিরক্ত হয়ে পুরো পর্তুগিজ ভাষায় কী বলল আমি কিছুই বুঝলাম না ।

আমি ইংরিজিতে বললাম, ‘কাকারা বোধহয় কোনও বিপদে পড়েছে, হয়তো জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছে, তুমি জঙ্গলের রাস্তা জানো?’

লোকটা উত্তর না দিয়ে আমাকেই প্রশ্ন করল, ‘আমাজনের গভীর জলে ডুব দিয়ে নদীর পেটের মধ্যে বোতোর শহরে যাবার রাস্তা তুমি জানো? হুঁ! আমাজনের জঙ্গলের রাস্তা!’

বলে সে হঠাৎ উঠে গিয়ে বোটের ইঞ্জিন চালু করল । তারপর বোটের মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, ‘যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ভেতরে গিয়ে চুপ করে বসো, আমি তোমাকে মানাউসে পৌঁছে দেব । যদি মরতে চাও, তাহলে বলো, তোমাকে জঙ্গলে নামিয়ে দিয়ে যাই । এখানে আর অপেক্ষা করে লাভ কী, আমি ফিরে যাচ্ছি ।’

লোকটার কথায় এই প্রথম আমার চোখ ফেটে জল এল। আমি শক্ত গলায় বললাম, ‘আমাকে জঙ্গলে নামিয়ে দাও।’

কাল কাকারা ঠিক যেখানে যেভাবে নেমে গিয়েছিল লোকটা আমাকে আজ প্রায় সেইখানে সেইরকম তক্তা পেতে নামিয়ে দিয়ে তক্তাটা তুলে নিয়ে, ধীরে ধীরে বোটের মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

আমার মন একেবারে শূন্য হয়ে গেছে, কী করব, এরপর কী হবে— কিছুই ভাবতে পারছি না। শুধু বোটের দূরে চলে যাওয়া দেখছি।

বোট ক্রমে খুব ছোট হয়ে এল, ছেলেবেলায় গামলার জলে খেলনা বোটের মতো দেখাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল বোটটা যেন এদিকেই ফিরে আসছে।

একটু পরে আর সন্দেহ রইল না যে বোট আমার কাছেই আসছে। এতেই আমার এত আনন্দ হল, যে যে-ভগবানকে কোনওদিন দেখিনি, হয়তো ভাবিনিও কখনও, সেই ভগবানের উদ্দেশে আমার সমস্ত মন নত হয়ে প্রণাম জানাল।

লোকটা বোটটাকে নদীর একেবারে কিনারে এনে যতটা পারে জঙ্গলের গায়ে লাগিয়ে সেই লম্বা তক্তাটা পেতে দিল। তারপর দুহাতে কাকাদের খাবার দাবারের দুটো ব্যাগ নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, ‘কোনটা নেবে বেছে নাও। তুমি বোতো কে জানো না, বোতোকে মানো না, তোমাকে এই আদি অন্তহীন অরণ্যে কে বাঁচাবে! অন্তত ব্যাগের খাবার আর জল খেয়ে যে কদিন পারো বাঁচার চেষ্টা করো। আমাকেও অনেক নদী পেরিয়ে অনেকটা পথ যেতে হবে, একটা ব্যাগ তাই আমাকেও নিতে হবে। তুমি কোনটা চাও— তোমার কাকারটা, না কাকার বন্ধুরটা, তুমিই বেছে নাও।’

তখন তুচ্ছ ব্যাগের চেয়ে অনেক গুণ বড় ভাবনা এত বড় বনে কোথায় যাব, কোথায় খুঁজব আমার কাকাকে, যতদিন খুঁজে না পাই ততদিন বেঁচেই বা থাকব কী করে।

তবু আমি কাকার ব্যাগটা নেওয়াই স্থির করলাম, আমার জামাকাপড়ও তো ওই ব্যাগেই আছে।

লোকটা এবার ‘দাঁড়াও, আসছি’ বলে জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল।

পাঁচ-সাত মিনিট পর লোকটা ফিরে এল, হাতের মুঠোয় হরীতকীর মতো সাত-আটটা ফল। গঞ্জালোর খাবারের ব্যাগে একটা লম্বা কাটারি ছিল, লোকটা সেই কাটারি দিয়ে এক কোপে একটা ফল আধাআধি কেটে ভেতর থেকে নরম তুলতুলে, অনেকটা তালশাঁসের মতো দেখতে, ছোট্ট একটা পোকা বের করে হাতের তালুতে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘এটা দেখে রাখো, আমাজনের জঙ্গলে পথ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত এই পোকা

খেয়েই মানুষকে বেঁচে থাকার লড়াই করতে হয় । এই ফল এই জঙ্গলে অনেক পাবে । আপাতত এগুলো রাখো । বোতোকে স্মরণ করো । বোতো তোমাকে রক্ষা করুন । আকাশের মতো পাড়হীন এই জঙ্গলে তুমি থাকবে কী করে । থাকবে কেন?’



আমার মুখে কেন কোনও কথা ফুটল না জানি না ।

লোকটা হঠাৎই দুটো ব্যাগের যেটা একটু ছোট, যেটা গঞ্জালোর, সেটা তুলে নিয়ে তক্তার ওপর দিয়ে দুড়দাড় শব্দে হেঁটে বোটে উঠে পড়ল । তারপর বোটের মুখ ঘুরিয়ে দূরের দিকে চলে গেল ।

তার বোট যখন তারই দেওয়া ছোট্ট তুলতুলে পোকাটার মতো ছোট হয়ে এল, তারপর একেবারে মিলিয়ে গেল, আমি কাকার ব্যাগটা তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে লাগলাম । কোথায় যাচ্ছি, কোনদিকে যাব, কিছুই জানি না । জঙ্গলের ভিজে, পচা, ঝরা পাতার ওপর কারও হেঁটে যাবার কোনও চিহ্ন থাকে না ।

ব্যাগটা ভারি, কী কী আছে জানি না । শুকনো খাবার, জলের বোতল ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে । তাছাড়া গঞ্জালোর লম্বা দা’টাও বোটচালক এই ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে ।

কাকাদের দেখা না পেলে আমার কী হবে, এই ভয়ানক জঙ্গলে কতদিন কীভাবে কাটবে ভাবতে ভাবতে আমার পা যেন আর চলে না । তার ওপর বিরাট বিরাট গাছ, মস্ত মস্ত ঝুরি । পাকানো তারের মতো অসংখ্য লতা ও ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে কখনও ঠেলে কখনও একটু ফাঁক করে এগনোও শক্ত ।

হাজার হাজার মাইল লম্বা শত শত নদী বুকে নিয়ে লক্ষ লক্ষ মাইল এই জঙ্গলের পৃথিবী থেকে রিও ডি জেনেরো কত দূর, কোথায়, কে জানে? কাকাকে না পেলে রিও ডি জেনেরোয় কে আমাকে নিয়ে যাবে? সেখান থেকেই আমার দেশে যাবার প্লেন ছাড়ার কথা । ভাবতে ভাবতে আমি একটা বিরাট বড় গাছের নিচে বসে পড়লাম । ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসছে ।





৪

ছ-দিন বা হয়তো সাতদিন ধরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যদি কোথাও কাকার দেখা পাই । হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যাই, যেদিকেই যাই, যেদিকেই চাই, শুধু বন আর বন । সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন অরণ্য ।

যেভাবেই হোক এক-একটা দিন শেষ হয়, আমিও বোটচালকের দেওয়া হরীতকীর মতো ফল একটা করে ফেলে দিই । মনে মনে ঠিক করেছিলাম এভাবেই আমি দিনের হিসেব রাখব । সব ফল শেষ, কটা দিয়েছিল এখন আর মনে নেই, হয়তো ছ-সাতটা । আটটাও হতে পারে । তাহলে আটদিন ধরে এই জঙ্গলে!

শরীর দুর্বল, চেহারা কীরকম হয়েছে জানি না । শুধু বিরাট বিরাট গাছ, গাছের পাতা, গাছের গুঁড়ি, শেকড় ঝুরি, পাখি প্রজাপতি কীট পতঙ্গ, লতা-পাতা ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ, বিরাট বিরাট মাকড়শার জাল—এইরকম কত কিছুর মধ্যে দিয়ে অন্ধলোকের মতো এগিয়ে চলেছি । মনে ক্ষীণ আশা হঠাৎ যদি কাকাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

সামনে ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে পারি, যতক্ষণ পারি এগোই । যখন আর পারি না, গাছতলায় শুয়ে পড়ি । একসময় ঘুমিয়েও পড়ি ।

একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি একটা ছোট ছেলে আমার সামনেই মাটিতে উবু হয়ে বসে আমার দিকে চেয়ে আছে ।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম । হঠাৎ এখানে একটা ছেলেকে দেখে যত না ভয় পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি অবাক হয়ে গেছি ।

ছেলেটির গায়ে কোনও জামা-প্যান্ট নেই, শুধু কোমরে ঘুনসির মতো কাঠের ছোট্ট ছোট্ট মূর্তির একটা মালা, মালার সঙ্গে আটকানো গাছের টাটকা পাতার তৈরি একটা ঢাকনা নাভির কাছ থেকে ঝুলছে । এই অদ্ভুত পোশাকের চেয়েও বেশি অবাক হলাম তার অদ্ভুত

শান্ত চোখ দেখে । বয়সে আমার থেকে অনেক ছোটই মনে হয়, আট-দশ বছর হবে হয়তো ।

চোখে চোখ রেখে চুপ করে বসে আছি, মনে মনে কথা বলে চলেছি, মুখে কিছুই বলতে পারছি না, কেননা এটা বুঝেছি যে ইংরিজি এখানে এক অক্ষরও চলবে না ।

ছেলেটা এবার ধীরে ধীরে মাটির ওপর থেকে বহু দিনের জমে থাকা শুকনো পচা পাতা সরিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করল । আমি দেখলাম পাতার জঞ্জাল ঠেলে সরিয়ে দেবার সময় সরু মোটা নানা ধরনের ছোট ছোট কাঠি সে আলাদা করে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখছে । গাছের বড় বড় ডালপালা থেকে যেসব ছোট ছোট সরু আঁকা বাঁকা ডাল বেরোয়, ছেলেটার নজর সেগুলির দিকেই । কোমরে ঝোলানো একটা থলে থেকেও সে এরকম কিছু কাঠকুটো বের করল । তারপর নানা আকারের বেশ কয়েকটা কাঠি পাশাপাশি ওপরে নিচে সাজিয়ে ছেলেটা আমার দিকে তাকাল, চোখ দেখে মনে হল আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছে ।

আমি তো এই কাঠি সাজানোর মানে কিছুই বুঝতে পারছি না । কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর হঠাৎ মনে হল এর মধ্যে একটা সূর্যোদয়ের ছবি আছে নাকি?

ছেলেটা আমার চোখ দেখে কী বুঝল জানি না, একটা হাতখানেক লম্বা কাঠি নরম স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পুঁতে তার গায়ে অনেকটা পুঁইমিটুলির মতো কিন্তু তার চেয়ে বড় একটা দানার রস টিপে তা দিয়ে ন'টা দাগ কেটে আবার আমার চোখে শান্তভাবে চোখ রাখল, মনে হয় আমার কাছে কোনও প্রশ্নের উত্তর আশা করছে ।

আমার এমনিতেই মাথা ঘুরছে, শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, দুপায়ে, হাতে, ঘাড়ে পোকার কামড়ে, লতা-পাতার বিষে ঘা হয়ে গেছে, এই অবস্থায়ও সাজানো কাঠিগুলো আর দাগানো বড় কাঠিটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল! ন'বার সূর্যোদয়ের কথা বলছে ছেলেটি । ন'বার কেন? কেন সূর্যোদয়?

হঠাৎ মনে হল এই বনে আমি ন'বার সূর্য-ওঠা দেখেছি কি না তা-ই জানতে চাইছে না তো? আমার মন বলছে, নিশ্চয়ই তাই । কতদিন এই জঙ্গলে আছি সেকথাই জিজ্ঞেস করছে । আমি তক্ষুনি একটা শক্ত কাঠি দিয়ে নরম ভিজে মাটিতে একটা সূর্যোদয়ের ছবি এঁকে তার পাশেই সতেরোটি দাগ কেটে দিলাম । ঠিক সতেরো দিনই জঙ্গলে ঘুরছি কিনা জানি না, দুয়েকদিন কম-বেশিও হতে পারে, কিন্তু সেকথা বোঝানো আরও শক্ত, তাই সতেরো দিনই আঁকলাম ।



স্কুলে ড্রয়িং-এ আমি বরাবরই ফার্স্ট হয়েছি, তাছাড়া বসে-আঁকো প্রতিযোগিতায় অনেকবারই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি, এখনও ভূগোল বিজ্ঞানের খাতায় স্যারেরা আলাদা করে আমার ড্রয়িংয়ের �প্রশংসা করেন। ছেলেটার শান্ত চোখের আনন্দ দেখেও বুঝলাম এখানেও আমার ছবি আঁকা বৃথা হয়নি। পুরো ছবিটা দেখে সে তার ন'দাগওলা কাঠির পাশে আরেকটা কাঠি পুঁতে তাতে একইভাবে আটটা দাগ এঁকে দিল। তারপরই আমাজনের উলি মাঙ্কির মতো দু-তিনটে লম্বা লাফে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফিরেও এল প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে। হাতে তিনরকম গাছের পাতা। তার মধ্যে গাঢ় হলদে আর বেগুনি রঙের পাতাগুলোর আকারও বেশ অদ্ভুত, প্রত্যেকটা পাতা নলের মতো পাকানো। দেখতে অনেকটা হাতির ওলটানো শুঁড়ের মতো। দুটো পাতার চেহারাই এক, শুধু রংটাই আলাদা। সবুজ রঙের পাতাগুলো অনেকটা মটরশুঁটির পাতার মতো, তবে কিছুটা পুরু, আকারেও একটু বড়।

ছেলেটা বেগুনি রঙের পাতা আমার নাকের কাছে ধরতেই একটা তীব্র মধুর ও কষা গন্ধ পেলাম। তারপর চিবোবার ভঙ্গি করে ওই পাতাগুলো আমাকে খেয়ে নিতে বলল। আমি যতই চিবোচ্ছি ততই যেন ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধটা আমার নাকমুখ দিয়ে আমার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, আমার শরীরটাও খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠছে টের পাচ্ছি।

ছেলেটা এবার হলদে পাতাগুলো তার হাতের তালুতে ডলে সেই রস আমার ফোঁড়ায়, ঘায়ে লাগিয়ে দিল। তার ইশারায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তেই সে আমার কপালে, বুকে, দুই কনুইয়ের ভেতর দিকে, দুহাতের নাড়িতে ও দুই হাঁটুতে একটা করে গোল ও মোটা সেই সবুজ পাতা লাগিয়ে দিল। এবার তার নির্দেশ মতো উঠে দাঁড়ালাম। আশ্চর্যের কথা, একটা পাতাও গা থেকে খুলে পড়ল না। এই অচেনা অদ্ভুত ছেলেটা যে আমার পরম উপকারী বন্ধু সে বিষয়ে আমার আর সন্দেহ রইল না। ঘোর বিপদে এরকম বন্ধু পেয়ে অনেক দিন পর আমার মন আনন্দে ভরে গেল। আনন্দ বলে যে কোথাও কিছু আছে তা-ই আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

এত উপকার পেয়ে চেপে রাখা খিদেটা যেন বহুগুণ বেড়ে গেল । কাঠি দিয়ে খচ খচ খচ করে মাটিতে ছবি এঁকে বোঝালাম যে আমার খুব খিদে পেয়েছে ।

ছেলেটা দেখছি যে কোনও জিনিস চটপট বুঝে ফেলে । ছবিটা এক মুহূর্ত দেখে, সে আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমাকে তার পেছন পেছন আসবার ইঙ্গিত করে ঠিক একটা কাঠবিড়ালির মতো জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চলল । আমি হেঁটে তাকে ধরতে পারছি না, পাছে আমার চোখের বাইরে চলে যায় তাই মাঝেমাঝেই আমাকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে হচ্ছে ।

এভাবে কতক্ষণ হাঁটছি কিছুই বুঝতে পারছি না, শরীরে আর আমার ক্লান্তি নেই, ফোঁড়া-ঘায়ের জ্বালা-ব্যথাও মিলিয়ে গেছে । আরেকটা জিনিস লক্ষ করলাম, আমার গায়ে সাঁটা মোটা মোটা সবুজ পাতাগুলো শুকিয়ে পাতলা হয়ে একে একে ঝরে পড়ছে ।

আধঘণ্টা বা হয়তো এক ঘণ্টা পর ছেলেটা এক জায়গায় খুব বড় বড় গাছের জটলার মধ্যে ঢুকে হাতের ইশারায় আমাকেও সেখানে ডেকে নিল । বিরাট বিরাট গাছের কাণ্ডে বার বার চোখ আটকে গেলেও ভেতরে দেখলাম অনেকটা খোলা জায়গা । এ যেন আমাদের বাংলার গ্রামের নিকানো উঠোন । তফাৎ শুধু, আমাদের দেশের উঠোনে এরকম বড় বড় গাছ থাকে না, থাকলেও উঠোনের শেষে বা এক ধারে দুয়েকটা গাছ থাকতে পারে, এখানে উঠোনের মধ্যেই মস্ত মস্ত গাছ সোজা আকাশে উঠে গেছে । উঠোনটি একেবারে পরিষ্কার তকতকে, জঙ্গলের অন্যান্য জায়গার মতো ভিজে স্যাঁতসেঁতে নয়, কোথাও একটা ঝরা পচা পাতাও চোখে পড়ল না ।



এক বাক্স প্যাস্টেল বা অন্তত একটুকরো কাঠ কয়লা পেলে এই উঠোন আমি ছবি এঁকে ভরিয়ে দিতাম । আমার বিপদের কথা, দুঃখের কথা সব ছবি এঁকে এঁকে এই শান্ত চোখের অদ্ভুত পোশাকের পরম উপকারী বন্ধুটিকে বলতে পারতাম । মায়ের আই ব্রাও পেনসিল দিয়ে আমি খসখসে পিচবোর্ডের ওপর কত ছবি এঁকেছি, আর এ তো শুকনো নিকোনো মাটি!

মায়ের কথা মনে পড়ে আমার বুকের ভেতরটা ব্যথায় যেন কঁকিয়ে উঠল। বাবাও নিশ্চয়ই এত দিনে আমার কোনও খবর না পেয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছেন!

আমার বন্ধু গাছের মস্ত মস্ত গুঁড়ির আড়ালে কোথাও গিয়েছিল, এখন হাতির কানের মতো গর্তওলা পুরু একটা পাতায় নানারকম খাবার এনে আমার সামনে নামিয়ে রাখল।

আমাদের দেশে গ্রামের দিকে মানী লোকেরা যেমন উত্তরীয় বা পাট করা চাদর ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে তার দুটি প্রান্ত বুকের দুদিকে ঝুলিয়ে রাখে, ছেলেটারও তেমনই ঘাড়ের ওপর দিয়ে শক্ত একটা লতার দু-মুখে বাঁধা বাবুই পাখির বাসার মতো দুটো পাত্র ঝুলছিল। পাত্র দুটো দেখতে অনেকটা বাংলা দেশের নলেন গুড়ের কলসির মতো। দুটো পাত্রই সে লতার বাঁধন থেকে খুলে আমার সামনে নিকনো মাটিতে রাখল। আঙুল দিয়ে সে যে পাত্রটা দেখাল, আমি দেখলাম তার ভেতরে জল। সেই পাত্রটা থেকে জল নিয়ে চোখেমুখে ভালো করে ছিটিয়ে দিতে ভারি আরাম বোধ হল। তারপর সেই জলেই হাত ধুয়ে নানা স্বাদের ফল মূল গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম।

এবার সে অন্য পাত্রটার দিকে ইঙ্গিত করল। হাতে নিয়ে দেখি দুধ। চুমুক দিয়ে চমকে উঠলাম, এ তো কোনও ফলের রস, দেখতে একদম দুধের মতো, টক-টক স্বাদ। ছেলেটা দেখলাম আমাকে পুরোটা খেয়ে নেবার জন্য বলছে। আমাদের এইসব ছোটখাটো কথা চলছে আকারে ইঙ্গিতে, চোখ মুখের ভাব ভঙ্গিতে, অনেকগুলো ইশারা এখন অনায়াসেই বুঝতে পারছি। ফলের রসটা চুমুক দিতে দিতে ছেলেটির ইশারা ইঙ্গিতে যেমন বুঝলাম, এটা এদের অতি প্রিয় ও প্রয়োজনীয় ফল। হয়তো এখানকার গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় খুবই উপকারী।

ছেলেটা এবার গন্ধকের মতো দেখতে এক টুকরো নরম পাথর বা রঙের ঢেলা আমার হাতে দিয়ে তার চোখ দুটি শুধু আমার চোখের ওপর রাখল, আমিও যেন স্পষ্ট শুনলাম, সে বলছে, কী করে এখানে এলে, কেনই বা এসেছ, কোথা থেকে এসেছ, সব কথা এবার বলো তো!

ছেলেটা তখনও তার সেই শান্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে আমার কেমন যেন আনন্দ হল, আমি তার চোখে চোখ রেখেই হেসে ফেললাম। আমাজনে এসে থেকে এই প্রথম আমি হাসলাম।

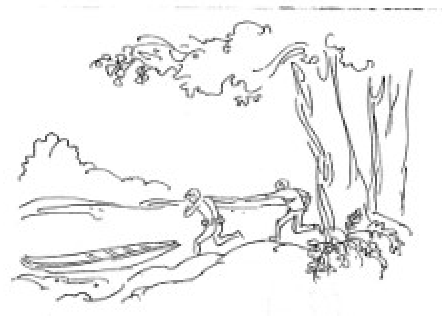
মাটিতে রঙের ঢেলা দিয়ে ছবির পর ছবি এঁকে বন্ধুকে আমি আমার সব কথা জানালাম। আমাদের পশ্চিমবাংলার ছবিটা খুবই ছোট করে আঁকতে হয়েছে বলে সেখানে শুধু কলাগাছ পাটগাছ শিউলি ফুল আর আমগাছ এঁকেছি। বন্ধু সবগুলোতেই চোখ বুলিয়ে কলাগাছ আর আমগাছটা দেখেই সকালের মতো নানা আকারের কাঠি দিয়ে তিনটে

চারাগাছ সমেত একটা কলাগাছ আর একটা আমগাছ বানিয়ে ফেলল । তার চোখ-মুখ দেখে বুঝলাম, কলাগাছ আর আমগাছ এরা চেনে, দুটো গাছ এখানেও হয় । আমাদের দেশ থেকে ব্রাজিল পর্যন্ত দূরত্ব বোঝাতে আকাশের অনেক নিচে ছোট্ট ছোট্ট কত যে নদনদী সমুদ্র পাহাড় বনজঙ্গল আঁকতে হল তা লিখে বোঝাতে হলেও অনেক সময় লেগে যেত । এভাবে বায়ুপথে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে রিও ডি জেনেরোর আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা আর সমুদ্রতীর, আর পাহাড় আঁকলাম । এরপর মানাউস, সেখান থেকে বোটে নিগ্রো, সোলিময়েস, আমাজন নদী, অন্যান্য উপনদী, নদীর মধ্যে অগুনতি দ্বীপ, কাকা, গঞ্জালো, কাকার ব্যাগ নিয়ে হনুমানের পালিয়ে যাওয়া, তাকে ধাওয়া করে কাকাদের জঙ্গলে ঢোকা, বোটচালকের ফিরে যাওয়া, আমার জঙ্গল জীবনের দুঃখ কষ্ট সবই যতটা সম্ভব ছবি এঁকে সংক্ষেপে বোঝালাম । তারপর তাকে পেয়ে আমার কত আনন্দ হয়েছে তাও আঁকলাম ।



দুজনে কেউ কারও ভাষা জানি না সেকথা যেন ভুলেই গেছি । হলুদ ঢেলা আর কাঠির টুকরো টাকরা দিয়ে ছবি এঁকে আর চোখ মুখের ভাব দিয়ে আমরা কথা চালাচ্ছি । এভাবেই আমার একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেল । আমি ভেবেছিলাম আমার বন্ধু বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট, এখন তার কাছে শুনে বুঝলাম সে আমার একেবারেই সমবয়সী । মাথায় বেঁটে আর মুখের চেহারা ছোটদের মতো বলেই আমার ভুল হয়েছিল । আসলে এদের দেশে বা এদের জগতে ৩৬৫ দিনে বছর হয় না । আমার বন্ধু নানা রঙের পাথর দিয়ে আর মুখে শব্দের ধ্বনি শুনিয়ে আমাকে বোঝাল তারা এক সূর্যোদয় থেকে আর একটা সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়টাকে বলে ইমানু আর বছরকে বলে ইদিমানু । তাদের ন'দিনে এক দিমানু, নয় দিমানুতে এক বিদিমানু, নয় বিদিমানুতে এক ইদিমানু । ৯ X ৯ X ৯, তার মানে ৭২৯ দিনে তাদের একবছর । আমাদের প্রায় দুবছরের সমান । আমার বন্ধু বয়স বলল সাত বছর, তার মানে আমাদের হিসেবে চোদ্দ, আমার সমবয়সী । আশ্চর্য সব রঙিন পাথর দিয়ে তারা তাদের ইমানু, দিমানু, বিদিমানু, ইদিমানুর হিসেব রাখে । ইমানু গোনে কচুরিপানা ফুলের মতো হালকা বেগুনি রঙের পাথর দিয়ে । এরকম ন'টি

পাথরে এক দিমানু, জোনাকির আলোর যে রং সেই রঙের পাথরে গোনা হয় এক বিদিমানু, আর বেদানার দানার মতো কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি গাঢ় রঙের ন'টি পাথরে গোনা হয় ইদিমানু ।



৫

ছেলেটার নাম উবা।

ঠোঁট সরু করে ভারি সুন্দর করে নিজের নাম বলল উবা। তারপর উবা কথাটার মানে বুঝিয়ে দিলে মাটির ওপর কাঠকুটো দিয়ে সরু এক চিলতে একটা নৌকো বানিয়ে। এখানকার ছোট নৌকোকে বলে উবা। এটা অনেকটা বর্ষাকালে বাংলার গ্রামে জলে-ডোবা মাঠঘাটে বা খালে-বিলে তালগাছের ডোঙার মতো।

উবা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমার ডান হাতটা ধরে একবার টান দিয়েই দৌড় লাগাল। আমাকেও তার পিছন পিছন ছুটতে হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটা উপনদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। এরকম ঘোর জঙ্গলের মধ্যে এত কাছেই একটা নদী এত জোর বয়ে চলেছে না দেখলে আমি ধারণাও করতে পারতাম না। পাড় ঘেঁসে নদীর ঢেউয়ের ধাক্কার তালে তালে নাচছে একটা উবা, সেটা আবার পাড়ের একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা।

উবা দড়িটা খুলে আমার হাতে দিয়ে জলের কাছে নেমে গেল। দড়িটায় অল্প টান পড়লেও মনে হচ্ছে হাত যেন কেটে যাবে।

আমি উবার ডাকে দড়িসুদ্ধু নিচে নেমে নৌকোয় উঠে বসলাম। উবাও দড়িটা নিজের হাতে নিয়ে নৌকোয় উঠল।

আমি ওর হাতের দড়িটার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে উবা জানাল, এটা নানান গাছের আঁশ দিয়ে তৈরি খুব শক্ত দড়ি। কথাটা বোঝাল ওর কাঠকুটো আর হাতের ভঙ্গি দিয়ে আর মুখে এই দড়িটার নাম বলল, এনভিরা।

একটু এগোতেই একটা ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হলাম। নদীর পাড়ে পর পর অনেকগুলো গাছে নানা মাপের, নানা চেহারার নৌকো বাঁধা আছে।

উবা নামে একটা ছেলের সঙ্গে উবা নামে এক ধরনের নৌকোয় চড়ে আমাজনের একটা উপনদীতে ঘুরে বেড়াব, আমার এই চোদ্দ বছরের জীবনে একথা আমি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি । মাঝে মাঝে পাড়ের ডালপালা গাছের ঝুরি লতা গুল্ভম থেকে গা-মাথা বাঁচিয়ে তর তর করে এগিয়ে চলেছি, নানারকম লতাপাতা ফুল ফলের অচেনা গন্ধ এসে নাকে লাগছে, এর মধ্যে ভিক্স আর অন্য কী যেন একটা ওষুধের গন্ধ আমার চেনা, সব মিলিয়ে মনে একটা আনন্দের ভাব ।

যদিও এখনও কাকার দেখা পাইনি তবু উবাকে পেয়ে জঙ্গলের সেই দম বন্ধ করা ভয় আর দুশ্চিন্তা আমার কেটে গেছে । গতকালও জঙ্গলে যখন রোজকার মতো আরও একটা বিভীষিকাময় রাত নেমে এল তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম আজ এরকম ঘটবে! মানুষের জীবনে সত্যি সত্যি যা ঘটে তা কখনও কখনও স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে যায়!

ডোঙা আগের মতোই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে উবা যখন আমাকে নিয়ে বড় বড় গাছে ঘেরা উঠোনের মতো জায়গাটায় ফিরে এল, তখন সেখানে নানা বয়সের কুড়ি-বাইশ জন মেয়ে-পুরুষ দেখে আমি অবাক হলাম । তাদের বাঁ হাতে নারকোলের মালা, মালা থেকে ডান হাতে রক্ত নিয়ে নিজেদের মুখে মাখছে । এরা কি পশু শিকার করে ফিরেছে— সকলের হাতের মালায় তারই রক্ত? নাকি জঙ্গলে পথ-হারানো কোনও মানুষ শিকার করে তার রক্ত মুখে মাখছে? সকলের হাতে মুখে রক্ত দেখে ভয়ে আমার বুক হিম হয়ে গেল ।

উবা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে, সে একটা ছেলের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে কয়েকটা শুকনো ফলের বিচি এনে জলে ঘষতেই টকটকে লাল রং তৈরি হয়ে গেল । সেই রং তার হাতের তিন আঙুলে নিয়ে আমার মুখে মাখাতে লাগল ।

তার কাঠকুটোর ভাষা আর মুখের কথার শব্দ মিশিয়ে সে আমাকে বলল— আমি মিথ্যেই ভয় পেয়েছি । ওগুলো রক্ত নয় । লাল রং । উরুকু ফলের বিচি গুঁড়িয়ে কয়েক ফোঁটা জল মেশালেই ওই রং তৈরি হয় । উরুকু কথাটার মানেই লাল রং । উৎসবের দিনে মুখে বেশ গাঢ় করে তারা এই রং মাখে । আজ সন্ধেবেলা এখানে তাদের উৎসব । এই গ্রামটা শুধু এই কুড়ি-বাইশজন মানুষের । গাছে ঘেরা এই জায়গাটা তাদের উৎসব প্রাঙ্গণ ।



হঠাৎ একটা মেয়ে নারকোলের মালা হাতে আমার কাছে এসে আমার ডান হাতটা মালার রঙে চুবিয়ে দিয়ে তার মুখটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল । মানুষ চাইলে ভাষা ছাড়াই কত কথা বলা যায় ।

উবা তখনও আমার মুখে রং লেপছে, মনে হয় কিছু একটা আঁকছে, আমিও কখনও মেয়েটার কপালে, কখনও উবার গালে রং লাগিয়ে দিচ্ছি । শেষ পর্যন্ত মেয়েটার কপালে আমাদের দেশের শালুক ফুল আর উবার দুগালে কৃষ্ণচূড়া এঁকে দিলাম ।

উঠোনে বড় বড় পাতায় বোনা ঝুড়িতে অনেক রকম ফল-মূল, খাবার-দাবার । মাটির মস্ত মস্ত হাঁড়িতে তিন-চার রকম ফলের রস বা অন্য কোনও পানীয় । কয়েকটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখা আছে বেঁটে বেঁটে কতগুলো ঢোল ও অচেনা কয়েকটা বাদ্যযন্ত্র । একটা উঁচু মতো জায়গায় বেশ বড় একটা নৌকো প্রথম থেকেই রাখা ছিল ।

উবার কাছে জানা গেল, আজ তাদের নৌকো উৎসব ।

উবা আমাকে ওই বড় নৌকোটার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'নৌকোটা একবার ভয়ানক বন্যায় ভাসতে ভাসতে আমাদের গ্রামের নদীতে এসে পড়েছিল, নৌকোয় কোনও মানুষ ছিল না, এর দাঁড়টি ভারি সুন্দরভাবে চিত্রিত, জঙ্গলের কোনও চিত্রকর ছাড়া আর কেউ এরকম দাঁড় বানাতে পারবে না । নৌকোটি আপনা আপনি ভেসে এসেছে বলে উৎসবের দিন প্রথমেই এটাকে আনা হয়, এটা আমাদের গ্রামের বা আমাজনের এই দিককার নয় । সারা বছর এটাকে ভারি যত্ন করা হয় । উৎসবের দিনে সবচেয়ে উঁচু বেদির ওপর রাখা হয় ।'

নৌকোর কথা বলতে উবার দেখলাম ভারি উৎসাহ । নৌকোটার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে সে বলে চলল, 'এই নৌকোকে বলে কাসকো, আমাদের উবার থেকে কাসকো আলাদা । একটা আস্ত গাছের গুঁড়ি থেকে কাসকো তৈরি করতে হয় । কুড়ুল দিয়ে গুঁড়ির ভেতরটা চেঁছে ফেলে তারপর আগুনের তাতে জায়গাটাকে অনেক চওড়া করা হয় ।

একটা আস্ত গুঁড়ি থেকে তৈরি বলে সাধারণ ক্যানোর চেয়ে কাসকো অনেক বেশি মজবুত । সাধারণ ক্যানো তৈরি হয় কাঠ জোড়া দিয়ে ।'

উবা আমাকে আরও অনেক রকম নৌকোর কথা শোনায় । নদীর দেশের মানুষ, জল-জঙ্গলের বাসিন্দা, নৌকোর বিষয়ে এরা বলবে না তো কে বলবে! নৌকো উৎসব এদের একটা বড় উৎসব । নৌকোর নামে এরা ছেলের নাম রাখে ।

মুখ রাঙানো, মুখ চিত্র-বিচিত্র করা শেষ হবার আগেই আরও দশ-বারো জনের একটা দল এল । তাদেরও মুখে লাল রং দিয়ে নানা নকশা করা । কেউ কেউ গালে-কপালে শুধু লাল রং লেপে দিয়েছে । তাদের সঙ্গেও খাবারের ঝুড়ি ও কয়েকজনের ঘাড়ে, কাঁধে বেঁটে বেঁটে ঢোল ও কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার বাদ্যযন্ত্র ।

মেয়ে-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের মুখেই লাল রং, কারও কম, কারও বেশি । মেয়েদের কোমরের মালা আরও চওড়া, তাতে কাঠের মূর্তি, ফল-মূল, লতা-পাতার বৈচিত্র্যও বেশি । তাছাড়া তাদের কানে রঙিন ফুল, সেও লাল রঙের, বাহুতে লতা-পাতা । এইসব লতা-পাতার আকার এতই সুন্দর যে যতই দেখি যেন তৃপ্তি হয় না । মনে হয় আমাদের দেশের গুণী স্বর্ণকাররা দিনের পর দিন একমনে বসে বসে এইসব লতা-পাতা গড়িয়ে দিয়েছে ।

সূর্য অস্ত যাবার সময় হয়ে আসছে । সকলে তাদের আনা ফল-মূলের ঝুড়ি, ফলের রস আর সরবতের হাঁড়ি কাসকোয় সাজিয়ে রাখছে । উবা এক ফাঁকে এসে আমাকে মেয়েদের কোমরে ঝোলানো পুঁতির মালার মতো দেখতে পাঁচ-সাত ছড়া একটা ফল দেখিয়ে জানিয়ে গেল, এর নাম আশাই । একেকটা ছড়ায় পঞ্চাশ-ষাটটা আশাই রয়েছে । ওরকম অনেক ছড়া নিয়ে আশাইয়ের এক-একটা গুচ্ছ হয় (এক বিদিমানুতে যত ইমানু তত বা তার চেয়ে বেশি) ।

একটা সরবতের হাঁড়ি দেখিয়ে শুধু হাতের নাড়াচাড়ায় আর গলার স্বরে উবা বলল, ওটা হল বিরাট চেহারার সাদা রঙের গাছ তাপেরবা-র ফলের রসের সরবত, ফলগুলো হলদে রঙের ।



উৎসবের ভিড়েও উবা আমার কথা একবারও ভোলেনি । অচেনা মানুষ অজানা ভাষা সত্ত্বেও আমি যাতে নিজেকে একা ভেবে কষ্ট না পাই সেজন্য সে বার বার এসে আমাকে এখানকার নানা জিনিসের পরিচয় বলে দিয়ে যাচ্ছে ।

চারজনে মিলে মস্ত বড় একটা কাঠের ডালায় ছোটছোট ভাজা মাছ বয়ে এনে নৌকোটার ওপর রাখছে দেখে উবা আমাকে জানাল, 'এর নাম টাম্বাকি, বড় সুগন্ধি মাছ, এরা শুধু ফল আর বীজ খেয়ে থাকে । খেয়ে দেখো, তোমার ভালো লাগবে ।' কাছে গিয়ে দেখি অনেকটা আমাদের খয়রা মাছের মতো দেখতে, চওড়ায় হয়তো একটু কম ।

উবার মা (উবাই বলে গেল, ওই ওর মা) এক ঝুড়ি পাকা পেঁপে হাতের লম্বা ছুরি দিয়ে মাঝখান থেকে দু-টুকরো করে বড় একটা ডালায় এমনভাবে সাজিয়ে রাখছিল যে দূর থেকে দেখে হঠাৎ মনে হয় একসঙ্গে অনেকগুলো সূর্যমুখী ফুটেছে । অবশ্য বেশকিছু পেঁপে দেখলাম ভেতরটা একদম লাল ।

উবা আমাকে দু-টুকরো পেঁপে দিয়ে গিয়েছিল, খেয়ে দেখি আমের মতো মিষ্টি ।

আটজন ছেলে বুড়ো (ওদের মধ্যে উবাও আছে) কাঠের ডালায় একটা তিন-চার ফুট লম্বা রোদে-শুকনো আস্ত মাছ বয়ে এনে ডালাসুদ্ধ নৌকোর মধ্যে নামিয়ে রাখতেই উবা আমাকে হাত নেড়ে ডাকল । কাছে গিয়ে দেখি, মাছটার শিরদাঁড়াটা বের করে নিয়েছে, ফলে ল্যাজা থেকে মুড়ো পর্যন্ত মাছটা দু-ফালি করা । একটা ফালির ওপর আরেকটা ফালি এমনভাবে রাখা যে মনে হয় মাছটা আস্তই আছে । উবা এর নাম বলল— পিরারুকু, খুব নাকি স্বাদ ।

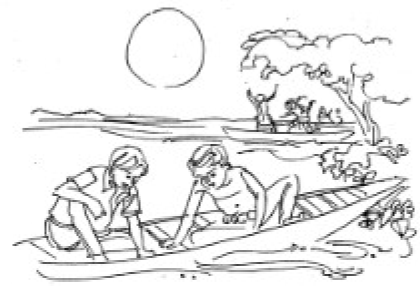
জঙ্গলের এক কিনারে সূর্য ডুবে গিয়ে আরেক কিনারে পূর্ণিমার চাঁদ উঠতেই সমস্ত জায়গাটা জুড়ে নাচ গান পান ভোজন শুরু হল । এদের বাজনার মধ্যে জঙ্গলের পশু-পাখি কীটপতঙ্গের ডাক আর আওয়াজ শুনতে শুনতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল । সেই রোমাঞ্চকর আওয়াজ ভারি সুন্দর ছন্দে-তালে বেজেই চলেছে ।

এবার আর শুধু উবা নয়, আরও অনেক ছেলেমেয়ে, বুড়ো বুড়ি আমাকে হাত ধরে তাদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল । নাচগানের মধ্যেই কেউ কেউ আমার হাতে নানা রকম খাবার তুলে দিল, কেউ দিল হাতির কানের মতো খোদলওলা পাতায় ফলের রস । সত্যি বলতে কী, আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ভুলে আমি যেন একটা আনন্দের নদীতে একটা ক্যানো চড়ে ভেসে চললাম । এত মানুষের এমন আনন্দ আর কোথাও আমি দেখিনি । এ যেন শুধু এই জঙ্গলেই সম্ভব, শুধু এই জঙ্গলের মানুষের পক্ষেই সম্ভব । সুগন্ধি টাম্বাকি মাছ আর পাকা পেঁপে আর নানারকম অচেনা কিন্তু সুস্বাদু ফলমূল খেয়ে আমার মন ভরে গেল । খাওয়াও এমন আনন্দের হয়!

সকলের খাওয়া হয়ে গেলে সবাই মিলে গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে, পশুপাখি কীটপতঙ্গের ডাক আর আওয়াজ সুরে-তালে বাজাতে বাজাতে নদীর দিকে চলল । নদীতীরে পৌঁছে সকলে নদীর পাড় বরাবর ছড়িয়ে গিয়ে গাছে-বাঁধা নানা মাপের নানা ধরনের নৌকো খুলে নিয়ে তাতে চড়ে বসল । উবা আমাকে তাদের নৌকোয় তুলে নিল । এবার আর সে দুপুরের উবাটা নেয়নি, অন্য একটা ক্যানোয় চড়েছি ।

নৌকোগুলো অনেকটা যেন আকাশে বকের সারির মতো এগিয়ে চলেছে । অনেক নৌকোতে গান-বাজনাও চলছে । হঠাৎ চাঁদের ওপর চোখ পড়তেই আমি চমকে উঠলাম— এত বড় চাঁদ আমি কোথাও কখনও দেখিনি । মনে হয় যেন আমাজনই চাঁদের নিজের দেশ ।





৬

এমন জঙ্গল, এমন নদী, এমন চাঁদ, এমন মানুষজন— কাকারা সঙ্গে থাকলে আমার তো দেখাই হত না! আর কোনও দিন বাড়ি ফিরতে পারব কিনা সেই ভয়ানক দুশ্চিন্তা সত্বেও কী করে আমার কাকাদের কথাটা এভাবে মনে এল জানি না ।

আমাদের একেবারে সামনের নৌকো থেকে ভারি সুরেলা বাজনা ভেসে আসছিল । হঠাৎ থেমে যেতেই উবা জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বেশ খানিকটা জায়গায় সতর্ক চোখ বোলাতে লাগল ।

দুয়েক মিনিটের মধ্যেই কাছে দূরে সব কটা নৌকোর গান-বাজনা থেমে গেল । আকাশে বিরাট চাঁদ, নিচে বিশাল নদী, মধ্যিখানে অদ্ভুত স্তব্ধতা ।

সেই স্তব্ধতার মধ্যে উবার ফিসফিস গলা শুনতে পেলাম— বোতো! বোতো!

তার বলার ভঙ্গি, চোখ-মুখের ভাব আর জলের দিকে আঙুল দেখানো থেকে বুঝলাম, উবা বলতে চাইছে বোতোকে দেখা গেছে!

বোতোর দেখা পাওয়া নাকি সবসময়ই ভালো, নৌকো উৎসবের রাতে দেখা পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের লক্ষণ ।

উবা আমাকে বুঝিয়ে দিল নৌকোয় নৌকোয় গান বাজনা থেমে যাওয়া মানে সকলে এতক্ষণে বোতোর দেখা পাওয়ার কথা জেনে গেছে । একটা নৌকোয় গান বাজনা থামলেই বাকিরা যারা যত আগে সেটা খেয়াল করবে তারা তত আগে তাদের নৌকোর গান বাজনা থামাবে । এভাবে কোনও একটা নৌকো থেকে বোতোর দেখা পাওয়ার দুয়েক মিনিটের মধ্যেই সব নৌকোয় সেই সুখবর ছড়িয়ে যায় । তখন সকলেই গান বাজনা থামিয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে চারদিক থেকে গোল হয়ে প্রথম নৌকোটার কাছে ফিরে আসতে থাকে ।

অন্যদের আর কথা কী, আমি নিজেও বোতোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম । বোতোই নাকি আমাজনে বিপদ আপদে মানুষকে রক্ষা করে! জলের তলায় তার মস্ত শহর, সেখানে রঙিন পাথরে তৈরি তার বিরাট প্রাসাদ!

হঠাৎ উবার ইশারায় নদীর জলে তাকিয়ে দেখি, খুব লম্বা মতো একটা প্রাণী তিন চার হাত জলের নিচে ধীরে ধীরে এঁকে বেঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার নাক বা ঠোঁট খুব সরু, লম্বায় প্রায় এক-দেড় হাত । মস্ত বড় মাথা, এর মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে বড় হলে আশ্চর্যের কিছু নেই । এর ল্যাজটা শরীরের শেষ প্রান্ত থেকে দুদিকে ভাগ হয়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে । রংটা ঠিক লাল কি? মনে হল যেন গোলাপীর দিকেই ।

যদি ডলফিন হয়, তাহলে পূর্ণিমা রাতে আমাজন নদীতে ডলফিন দেখাও তো ভাগ্যের কথা, কজনের সে ভাগ্য হয়? আর যদি আমাজনের দেবতা হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমার মনের কষ্ট আর প্রার্থনা বোতোর অজানা থাকবে না! জলের নিচে বোতোকে দেখতে দেখতে আমি মনে মনে বললাম, বোতো, তুমি কে, আমি জানি না । তুমি যদি সত্যিই আমাজনের রক্ষাকর্তা হও, তুমি আমাকে আমার মা বাবা আর স্কুলের বন্ধুদের কাছে ফিরে যাবার উপায় করে দিও ।

একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার, চারদিক থেকে অতগুলো নৌকো একেবারে কাছে এসে ঘিরে ধরেছে, তবু বোতোর কোনও রাগ ভয় বিরক্তি নেই, সে আপনমনে আনন্দে মশগুল হয়ে খুব ধীরে ধীরে জলের মাত্র তিন-চার হাত নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনও কখনও জলের ওপরেও উঠে আসছে, সবসময়ই আনন্দে বিভোর, মনে হয় সে যেন তার মনের ভেতরের সুরে তালে ছন্দে লয়ে নেচে বেড়াচ্ছে ।

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে উবা একেকদিন হঠাৎই হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে । তারপর আমাকেও বসতে বলে । তার গভীর চোখ দুটি আমার দুচোখের ওপর মেলে রেখে অনেকক্ষণ ধরে কী দেখে সে-ই জানে । মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার চোখের মধ্যে দিয়ে বহু দূরের কিছু সে দেখছে বা দেখবার চেষ্টা করছে ।

বেশ কিছুদিন এরকম হবার পর, একদিন সকালে উবা একই ভাবে হাঁটু গেড়ে বসে আমার চোখে চোখ রেখে মাটির ওপর তার কাঠকুটোর ছবি তৈরি করতে লাগল । ছবি দেখে আমি বুঝলাম, উবা আমার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে চায়, আমি কে? জানতে চায়, আমি কোথা থেকে এসেছি । কোন পৃথিবীর মানুষ আমি, সেই পৃথিবীটা কীরকম?



এ প্রশ্নের উত্তর আমি কীভাবে বোঝাব জানি না । ভাবলাম, যে-কলকাতায় আমরা থাকি, সেই কলকাতার কথাই ওকে বলি । শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে চিন্তে বেশ বড় দেখে একটা জায়গা পরিষ্কার করে খুব মন দিয়ে সেখানে একটা ছবি এঁকে যতটা পারি আমার কথা, আমার বাবা-মায়ের কথা, বন্ধুদের কথা, স্কুলের কথা, কলকাতা শহরের কথা, শহর ভরা ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া, দোকানবাজার, লোকজনের কথা বোঝালাম । কলকাতা নামটাও তাকে বার কতক শুনিয়েছি ।

উবা ওই মস্ত বড় ছবির ওপর ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো ছবিটা দেখেই আবার তার কাঠকুটো সাজাতে লাগল । এই কাঠকুটো দিয়ে ছবি আঁকায় উবা ভারি ওস্তাদ । এক পলক চোখ বুলিয়েই তার বলবার কথাটা আমি বুঝে নিলাম ।

উবার মুখে কলকাতা কথাটা শুনে আমার এত আনন্দ হল যে কী বলব! দুই ঠোঁট গোল করে জিভ নেড়ে অদ্ভুতভাবে শব্দটা উচ্চারণ করে আর ছবি দেখিয়ে ও বলল, ‘কলকাতায় জঙ্গল নেই, পাখি নেই, প্রজাপতি নেই, বড় বড় নদনদী নেই, তুমি সেখানে থাকো কী করে? ও তো শুধু বালির দেশ!’

বালির দেশ অর্থাৎ মরুভূমি! কলকাতায় থাকতে, কই, একথা তো কখনও মনে হয়নি । এখন আমাজনের জঙ্গলে বসে উবার মুখে শুনে মনে হল, সত্যিই তো, কলকাতায় ঘন সবুজ বনজঙ্গল, পাখি, প্রজাপতি এসব তো দেখা যায় না!

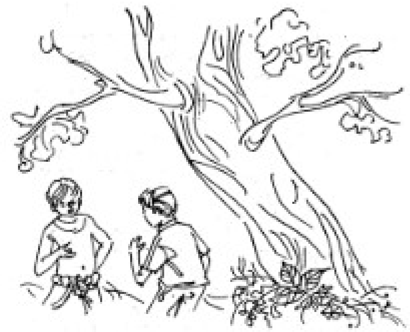
ভ্যানরিকশায়, অনেকটা টিনের বড় বাক্সের মতো দেখতে চারদিক বন্ধ গাড়িতে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা গাদাগাদি করে বসে স্কুলে যাচ্ছে— সেই ছবিটা দেখে উবা আমার দিকে তাকাল । এই ছবিটার মানে সে একেবারেই বুঝতে পারেনি । টিনের দেওয়ালে ছোট ছোট জানলার ফাঁক দিয়ে কেউ কেউ তার কচি মুখ তুলে বাইরেটা দেখতে দেখতে চলেছে, উবা সেই মুখের ওপর অনেকক্ষণ ঝুঁকে রইল, তারপর মুখ তুলে আমার কাছে এই ছবিটার মানে জানতে চাইল ।

আমাজনের জঙ্গলে স্কুল কী করে বোঝাব! আরও কয়েকটি ছবি এঁকে যতটা সম্ভব স্কুলের বিষয়ে বললাম । উবা বেশ খানিকক্ষণ আমার চোখে চোখ রেখে চুপ করে বসে

বসে ভাবল । তারপর তার কাঠকুটোর ছবি দিয়ে বলল— জঙ্গলের গাছপালা ফুল ফল কীটপতঙ্গের সঙ্গে না থেকে, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত না দেখে কলকাতায় বসে তুমি কী করে এই জগৎটাকে জানবে?

এর পরই উবা হঠাৎ আমার একটা হাত নিজের দুহাতে নিয়ে, আমার দু-চোখে তার সেই গভীর দু-চোখের দৃষ্টি রেখে মুখে কোনও শব্দ উচ্চারণ না করে বলল— তুমি আর ওই দেশে ফিরে যেও না!





৭

উবাদের গ্রামে এরমধ্যে আমার বেশ কয়েক দিন কেটে গেছে । বেশ সুখেই কাটছে । তাছাড়া প্রতিদিনই এদের জীবনের কত নতুন কথা জানছি, নতুন দিক দেখছি, সেও এক মস্ত আনন্দ!

একদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই উবা বড় বড় ঝরা পাতার শক্ত শিরায় বোনা থলে থেকে কচুরিপানা ফুলের রঙের নটা স্বচ্ছ পাথর বের করে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আমাদের গ্রামে তোমার তিন দিমানু হল । পুরো একটা ইদিমানু এখানে থাকবে তো?'

এক ইদিমানু মানে? মনে পড়েছে, ৯ X ৯ X ৯ = ৭২৯ দিন, আমাদের দুবছর! তার অনেক আগেই তো আমার মাধ্যমিক! তাছাড়া ততদিন আমাকে না দেখে, আমার কোনও খোঁজখবর না পেয়ে আমার মা-বাবার কী হবে? একটা কোনও খবর পাঠাতে পারলেও না হয় কথা ছিল, তাহলে অন্তত আরও সাত-আট দিমানু (৬৩ বা ৭২ দিন) থেকে যেতাম! অবশ্য উবার কথা মতো যদি এক ইদিমানু থেকেও যাই, তার পরেই বা দেশে ফেরার কী উপায় হবে? চিঠি টেলিগ্রাম টেলিফোন ফ্যাক্স ই-মেলের জগতের বাইরে উবাদের জগৎ!

একদিন আমি উবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমাদের ন-দিনে এক দিমানু হয় কেন?'

আমি ধরে নিয়েছিলাম, আমাদের যেমন সপ্তাহ ওদের তেমনই দিমানু । তাহলে ন'দিন কেন?

উবা অদ্ভুতভাবে কাঠকুটো সাজিয়ে প্রথমে একটা তারা ভরা আকাশ আঁকল, তারপর সেখানে ন'টা শূন্য এঁকে সেই ন'টা শূন্যের মধ্যে হালকা বেগুনি রঙের ন'টা পাথর রেখে প্রত্যেকটা শূন্যের এককেটা নাম বলে গেল । উবার কাঠকুটোর ছবি দেখে আর তার মুখের কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, আকাশে ন'টি গ্রহ বলে ন'দিনে তাদের সপ্তাহ । তাদের সপ্তাহের ন'দিনের নামও ন'টি গ্রহের নামে । নামগুলো উবার মুখে পরে আরও

কয়েকবার শুনে আমি একটা মোটা লতার শুকনো মোলায়েম পাতায় কী-একটা ফলের রঙিন রস দিয়ে লিখে আমার ব্যাগে রেখে দিয়েছি ।

যতই এদের জগৎ দেখছি, এদের জীবন দেখছি, ততই যেন এই রহস্যময় জলজঙ্গল আমাকে গভীর ভাবে টেনে নিচ্ছে ।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত উবাদের সঙ্গে জলে-জঙ্গলে ঘুরি আর এদের মতোই এখানকার কীটপতঙ্গ পশুপাখি গাছপালা লতাগুল্ভমের খোঁজখবর নিই । খাবার, সাজবার ফল ও বীজ, ওষধি গাছের শেকড়-বাকড়, ফুলের পাপড়ি, গাছের ছাল, কীটপতঙ্গের পালক পাখনা কুড়িয়ে বেড়াই । এখানে গাছ ফুল লতা পাতা কীটপতঙ্গ দেখেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় । জঙ্গলে এদের জীবনযাত্রা দেখে কত কী যে শেখা যায় তারও কোনও শেষ নেই । বড় বড় পশুপাখির তো কথাই নেই, ছোট্ট ছোট্ট পোকাদের বাসা বাঁধা, খাবার জোগাড় করা, তাদের বাচ্চা বড় করা, বিপদে আপদে আত্মরক্ষার দক্ষতা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় । আর, কত রকম তাদের রং আর গড়ন, শুঁড় বা পাখনা! আমি শুধু প্রজাপতিই দেখেছি পঁচিশ রকম । অদ্ভুত আশ্চর্য ফুল যে কত দেখেছি তা গোনাই অসম্ভব ।

উবাদের দেখে মনে হয়, তারাও যেন এই বনের কীটপতঙ্গ লতা-গুল্ভমের মতোই আরেকটা প্রাণী । তাদের জীবনে যা কিছু দরকার সব তারা এই অরণ্য থেকেই পায়, অরণ্যই তাদের পিতা মাতা । এদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম অরণ্য-উৎসব । নৌকো-উৎসবের চেয়ে এই উৎসব অনেক বড়, ভোর থেকে শুরু হয়ে সন্ধে পর্যন্ত আনন্দের বন্যা বয়ে যায় । অরণ্য-উৎসবে বহু দূর দূর গ্রামের মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে যায় ।

দিনের শেষে রোজই সবাই গ্রামে ফিরে নানা রকম ফলের রস থেকে তৈরি সরবত খেয়ে খানিকক্ষণ নাচ গান করে, তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে সারাদিনের ঘটনা বা অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে ।



আমার শোবার জায়গা উবার পাশে । এদের এই শুয়ে শুয়ে গল্প করার বিষয়ে উবা আমাকে বলেছিল, এরা সারাদিন এই অরণ্যের কোথায় কী দেখেছে, কোথাও কোনও অদ্ভুত কিছু ঘটেছে কি না এইসব বিষয়েই নিজেদের মধ্যে কথা বলে ।

একদিন এইরকম নাচ গান খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে গল্প হচ্ছে, হঠাৎ আমার পাশের ছেলেটি উবাকে কী সব বলল, তারপর দুজনেই উঠে দাঁড়াল । ইতিমধ্যে অন্যরাও উঠে দাঁড়িয়েছে । সকলেই ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে উবাদের দুজনের কথা শুনছে, নিজেরাও কিছু বলাবলি করছে । মনে হল, যেন একটা জরুরি সভা শুরু হয়েছে ।

হঠাৎ সকলে হাঁটু গেড়ে বসে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে গলা দিয়ে অদ্ভুত সুরেলা গোঙানির মতো আওয়াজ করতে লাগল । সুরটা আমার চেনা লাগল, এখানকার কী যেন একটা বড় আকারের পাখি, তার গলা ও বুকের মাঝখানে রামধনুর রং নিচ থেকেও আমার চোখে পড়েছিল, সেই পাখিটার গলায় আমি ঠিক এই সুরে এইরকম গোঙানি শুনেছি । উবা আমাকে বলেছিল, সাপ এসে পাখিটার ডিম খেয়ে গেছে দেখে সে এইরকম সুরে ডাকছে । অন্য সময় তার ডাক একেবারে আলাদা, এখন তুমি কিছুতেই তা শুনতে পাবে না ।

এদের গলায়ও সেদিনের সেই পাখির সুর, তার মানে এদেরও কি তবে বড় কোনও বিপদ হয়েছে?

এরই মধ্যে দূর থেকে ঠিক একই সুরে একই বিলাপ ধ্বনি ভেসে এল । তারপর আরেক দিক থেকে আরও অনেক দূরে এরকম শোনা গেল । ক্রমে বহু দূরে দূরে এই সুরেলা গোঙানির শব্দ জেগে উঠল । যেমন আমাদের দেশে ভূমিকম্পের সময় প্রথমে কাছাকাছি বাড়ি থেকে শাঁখ বাজে, পরে অনেক দূর দূর সব জায়গা থেকেই শাঁখ বাজতে শোনা যায়, এও যেন অনেকটা তেমনই ।

উবা তার কাঠকুটো দিয়ে, হাত নেড়ে, আঙুলের ওঠা-নামা, মুখ-চোখের ভাব ভঙ্গিতে, গলার স্বরে আমাকে যা বলল, তা এইরকম— আজ উবাদের গ্রামের একজন অনেক দূরের জঙ্গলে, যেখানে তিন নদী জড়াজড়ি করতে করতে আমাজন নদীতে এসে পড়েছে সেখানকার আকাশে মস্ত বড় আর বিকট চেহারার পাঁচ-ছটা পাখিকে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে উড়তে দেখা গেছে ।

‘আকাশে যাদের উড়তে দেখেছে তারা কি এত বড়?’ বলে আমি হাত দিয়ে এই ঘরটাকে দেখাই ।

যে লোকটা তিন নদী আমাজনে পড়বার জায়গাটায় গিয়েছিল সে বলল, ‘সেই উড়ন্ত প্রাণীগুলো একেকটা এই ঘরটার মতো তো নিশ্চয়ই!’

‘তাদের পিঠে কি কিছু ঘুরতে দেখেছ?’

সে বলল যে সেই পাখির পিঠে মস্ত বড় মাকড়শার জাল দেখেছে ।

কথা হচ্ছিল উবার মধ্যস্থতায় । সব শুনে আমার মনে হল, এ কি তবে হেলিকপ্টার দেখেছে?

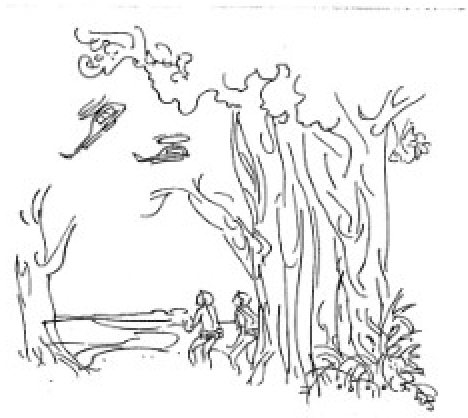
আমি মাটিতে বেশ বড় করে একটা হেলিকপ্টার এঁকে উবাকে বললাম, ‘ও কি এইরকম কিছুকে দেখেছে?’

উবা কিছু বলবার আগেই সেই লোকটা এক লাফে আমার কাছে এসে ছবিটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বেশ খানিকক্ষণ মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটা দেখল, তারপর মুখ তুলে মাথা নেড়ে জানাল যে অনেকটা এরকম কয়েকটা প্রাণীকেই সে দেখেছে ।

এত দূরে আমাজনের জঙ্গলে হঠাৎ পাঁচ-ছটা হেলিকপ্টার কেন?

দেখলাম সকলেই বেশ ভয় পেয়েছে । এই উড়ন্ত প্রাণী যে আসলে হেলিকপ্টার সেটা বুঝে আমারও মনটা দমে গেছে । হঠাৎ মনে হল, কাকারা আমাকে না পেয়ে মানাউস বা রিওয় ফিরে গিয়ে হেলিকপ্টার নিয়ে জঙ্গলে আমার খোঁজে আসেনি তো?

আমি উবাকে বললাম, ‘তিন নদী যেখানে জড়াজড়ি করে আমাজন নদীতে পড়েছে, কাল আমাকে সেখানে নিয়ে চলো ।’



৮

এই তিনটে নদীর কোনওটাই তেমন চওড়া নয়, আমাদের সিকিমের পাহাড়ি নদীর মতো সরু ও খরস্রোতা ।

ভোরবেলা রওনা হয়ে আমরা যখন এই তিন নদীর কাটাকুটি খেলা দেখতে দেখতে আমাজন নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম সূর্য তখন প্রায় আমাদের মাথার ওপরে ।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, হেলিকপ্টারের আওয়াজ আমার খুবই চেনা, তবে এখানে এত বড় নদীর ওপরে বলেই কি না জানি না দুটো মাত্র হেলিকপ্টারের শব্দে মনে হচ্ছে যেন আকাশে-নদীতে-জঙ্গলে একেবারে হুলুস্থুল পড়ে গেছে ।

দূরে আরও দুটো হেলিকপ্টার দেখা গেল, সে দুটোও এদিকেই আসছে । এই তিন নদীর মোহনার ওপরে এসে কখনও জঙ্গলের মাথায়, কখনও নিচে নদীর ঠিক ওপরে চক্কর দিচ্ছে ।

যে দুটো নিচে নেমে এসে জলের কাছে ঘুরছিল, সেই দুটো হেলিকপ্টারেই ভেতরের লোকদের স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কাকা বা গঞ্জালো বা পুলিশের চেহারার কেউ না । দুটো হেলিকপ্টার থেকেই বড় লম্বা লেন্স লাগানো ক্যামেরায় চারদিকের ছবি তুলছে সেটা সহজেই বোঝা যায় । একজনের হাতে মনে হল ভিডিও বা মুভি ক্যামেরা । একটা হেলিকপ্টারে দেখলাম, যে ছবি তুলছে সে মাঝে মাঝেই ক্যামেরা থেকে চোখ নামিয়ে কোলের ওপর ঝুঁকে কোনও কাগজ বা ম্যাপ বা ওই ধরনের কিছু দেখছে ।

ক্রমে চারটে হেলিকপ্টারই একবার করে জঙ্গলের মাথায় চলে যায় আবার আমাজন নদীর ওপরে ফিরে আসে, কখনও কখনও খুব নিচু হয়ে তিন নদীর মোহনারও ছবি তোলে ।

উবা, আর যে লোকটা কাল এখানে এসেছিল সে আর আমি ছাড়াও আমাদের দলে আরও দুজন আছে। এদের একজন উবাদের গ্রামের মোড়ল, আরেকজন অন্য একটি দূর গ্রাম থেকে এসেছে, সেও তার গ্রামের মোড়ল।

আমরা পাঁচজন চারটে বিরাট চেহারার ব্রাজিলনাট গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হেলিকপ্টারগুলোর ওপর নজর রাখছি। দুটো হেলিকপ্টার অনেকটা নিচে নেমে জঙ্গলের ভেতরের ছবি তুলছিল, হঠাৎই নদীতীরের জমিতে নেমে পড়ল। অন্য হেলিকপ্টারগুলোও বোধহয় তাদের দেখাদেখি একে একে মাটিতে নেমে এল।

লোকগুলো এবার হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। দুজন তখনও ছবি তুলে চলেছে, বাকিরা খুব বড় একটা কাগজ মাটির ওপর বিছিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

আমরা হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে নদীর উঁচু পাড় পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। ভালো করে ঠাহর করে দেখে মনে হল লোকগুলো যে কাগজটার ওপর ঝুঁকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে ও মাঝে মাঝে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে সেটা খুব বড় একটা ম্যাপই।

উবারা হেলিকপ্টার কী জানে না। এরকম অদ্ভুত ডানাওলা এতগুলো জন্তু কেন তাদের নদী আর জঙ্গলের দেশে এসেছে ভেবে পাচ্ছে না। বুঝতে পারছি, তারা খুবই ভয় পেয়েছে।

লোকগুলোর মধ্যে দু-তিনজন মনে হয় ব্রাজিলের, বাকিরা ইউরোপীয় বা আমেরিকান বলে মনে হল। আমি উবাকে বললাম, 'তোমরা এখানে থাকো, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝে আসি ওরা কী চায়, কেন এসেছে এখানে?'

উবা আমাকে এভাবে একা যেতে দিতে চায় না। তার কাছে আমার ইচ্ছের কথা শুনে অন্যরাও হাত মাথা নেড়ে আমাকে নিষেধ করতে লাগল। উবা আরও যুক্তি দিল, 'একে তো অতগুলো বিকট জন্তু, তার ওপর অতগুলো ভিনদেশি লোক, ওখানে গেলে ওই জন্তুগুলো ঠিক তোমাকে জাপটে ধরে একদম আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

'না না, ওদের সামনে যাবার আগে আমি শান্তির পতাকা দেখাব, তাছাড়া ওরা তো সবাই খারাপ লোক নাও হতে পারে।'



মোড়ল দুজন কিছুতেই শুনবে না, বলল, যদি আমি যেতেই চাই, তারা আগে গ্রাম থেকে সবাইকে নিয়ে আসবে । গ্রামের সবাই দক্ষ শিকারি, ছেলে-বুড়ো সকলেরই তীর ধনুক আছে ।

সে তো আমিও জানি । কিন্তু শিকারি দিয়ে এ রহস্য তো ভাঙবার নয়! আমি তাই অনেক করে তাদের বুঝিয়ে, এখনই ফিরে আসব, কথা দিয়ে একটা বেশ বড় কচুগাছের ধবধবে সাদা পাতা বোঁটাসুদ্ধ ছিঁড়ে যতটা পারি উঁচু করে ধরে দোলাতে লাগলাম । এই কচুপাতাগুলো ঘুড়ির কাগজের মতো পাতলা, লম্বা, বোঁটা ধরে এদিক-ওদিক দোলালে হাওয়ায় সড়সড় করে শব্দ হয় ।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমার সাদা পতাকা ওদের চোখে পড়ল । একজন আমাকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে বলল, 'হাই! হোয়াট আর য়ু ডুয়িং দেয়ার, বাড্ডি?'

'হেলো' 'হাই' আজকাল আমাদের দেশের ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেমেয়েরাও বলে । বাড্ডি কথাটাও কোথাও পড়েছি, মানেটা মনে করতে পারছি না, হঠাৎই মনে পড়ে গেল— বাড্ডি মানে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দোস্ত ।

আমিও যতটা সম্ভব চেঁচিয়ে ইংরিজিতে বললাম, 'তোমরা কে? তোমরা কোথা থেকে আসছ? কীভাবে তোমাদের সাহায্য করতে পারি?'

'কাম ডাউন, প্লিজ কাম ডাউন । তুমি এই জঙ্গলে এলে কী করে? তোমার দেশ কি পাকিস্তান, না মরিশাস, নাকি শ্রীলঙ্কা?'

আরেকজন বলল, 'আর য়ু কামিং ফ্রম বাংলাডেশ?'

'আই অ্যাম ফ্রম ইন্ডিয়া ।'

উবাদের আরেকবার আশ্বস্ত করে আমি ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে নদীর চড়ায় নেমে গেলাম ।

এবার আমি হেলিকপ্টারগুলোর দিকে এগিয়ে যেতেই ওই বিদেশি সাহেবরা আমাকে দেখে আনন্দে হইচই লাগিয়ে দিল ।

একজন আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'য়ু আর নট আ জঙ্গলি, আর য়ু?' (তুমি তো দেখছি জংলী নও, না কী?)

আরেকজন সেই সাহেবটার দিকে ফিরে বলল, 'হি ইজ এ জেন্টল ম্যান । ইজন্ট হি?' (এ একজন ভদ্রলোক, তাই না?)

আরেকজন অন্যদের ঠেলে আমার একেবারে সামনে এসে বলল, 'হেই! হাউ হ্যাভ য়ু কাম হিয়ার? হাউ কুড য়ু রিচ হিয়ার?' (এই! তুমি এখানে এলে কী করে? এখানে পৌঁছলে কী ভাবে?)

আরেক সাহেব আরও জোরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বিন হিয়ার লং?' (এখানে কি অনেকদিন আছ?)

আরেকজন বলল, 'এই জঙ্গলে থাকো কোথায়?'

যে আমাকে জেন্টলম্যান বলেছিল, সে এবার কোকাকোলার একটা টিন একটানে মুখটা খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'ফিলিং থার্স্ট্রি?' (তেষ্টা পেয়েছে?)

আরেকজন এক প্যাকেট বিস্কুট এনে প্যাকেটের মুখটা ছিঁড়ে আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'কবে কীভাবে কোত্থেকে এখানে এসেছ, কেনই বা এসেছ, একটু খুলে বলো তো বাপু! তুমি নিশ্চয়ই একা থাকো না, কাদের সঙ্গে থাকো?'

এরা কারা, কেন এখানে এসেছে, কেনই বা নদী আর জঙ্গলের ছবি তুলছে, অত বড় ম্যাপটাই বা কিসের, এসব আমি কিছুই জানি না । ম্যাপ নিয়ে দলবেঁধে এরা আমাজনের জলে জঙ্গলে কোনও গুপ্তধনের সন্ধান করছে না তো? এদের কাছে সব কথা খুলে বলা বোধহয় ঠিক হবে না । আমি শুধু বললাম, কাকার সঙ্গে বেড়াতে এসে জঙ্গলে কী করে যেন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল । তারপর অনেক খুঁজেও কাকার দেখা পেলাম না । জঙ্গলে পথ হারিয়ে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছি ।

আমার একথা শুনে সাহেবরা নিজেদের মধ্যে চাওয়া চাউয়ি করল । একজন বলল, 'তোমার কাকার নাম কী? থাকেন কোথা?'

আরেকজন বলল, 'কাকার পুরো ঠিকানা কী?'

পাছে রিওয় কখনও পথ হারিয়ে ফেলি, তাই দেশে থাকতেই মায়ের কথা মতো আমি কাকার ঠিকানা মুখস্থ করে রেখেছিলাম । ঠিকানা শুনে সাহেবরা আরেকবার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় করল । তারপর তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কোথায় তোমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল?'



'এখানে থেকে অনেক দূরে। জঙ্গলের মধ্যে, সে জায়গাটার কোনও নাম আছে কি না জানি না।'

'তার কাছাকাছি, ধরো বিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোনও জায়গার নাম বলতে পারো?'

'নিগ্রো আর সোলিমেয়েস নামে কালো আর হলদে জলের দুটো নদী যেখানে আমাজন নদীতে এসে পড়েছে, সেখান থেকে মনে হয়, দেড়-দুশো মাইল এগিয়ে আমাজন নদীর ডান তীরে কোথাও কাকা নেমেছিলেন আর ফেরেননি। সেখান থেকেই আমি কাকার খোঁজে জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলি। সে জায়গাটাও এখান থেকে দু-তিনশো মাইল হবে হয়তো।'

সাহেবরা খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল। একজন হঠাৎ বলল, 'পথ হারানোর পর থেকে তুমি কতদিন এই জঙ্গলে আছ?'

'মনে নেই, বলতে পারব না।'

'একা থাকো, না কারও সঙ্গে?'

আমার মন বলছে, উবাদের কথা এদের জানানো ঠিক হবে না, মিথ্যে করে বললাম, 'একাই থাকি।'

'ঘুমোও কোথায়?'

'কাকার খোঁজে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে যেদিন যেখানে পৌঁছে সন্ধে নামে, সেদিন সেখানেই রাতটা কাটিয়ে দিই।'

'খাও কী?'

'জঙ্গলের অনেক ফলই খেতে শিখেছি, খেতে খুব ভালো। ফলের রস খেয়ে তেষ্টাও মেটাই। তাছাড়া কয়েক রকম ফল আছে, খোলা ভাঙলেই ভেতরে চমৎকার বাদাম!'

বলে আমার হঠাৎই খেয়াল হল এরা এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছে সেটা তো এখনও জানা হল না। ওদিকে উবারা আমার অপেক্ষায় নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে সামনের লোকটাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা এখানে কেন এসেছ? কী করছ এখানে?'

'আমাজনের এই রেইন ফরেস্ট আমরা মাপ জোক করছি ।'

'জঙ্গলের ছবি তুলে কী করবে?'

'জঙ্গল মাপতে হলে তার ছবি তো তুলতেই হয় ।'

'কেন জঙ্গল মাপছ?'

'এই জঙ্গল কাটা হবে, তাই ।'

'সে কী!' আমার মুখ থেকে প্রচণ্ড একটা আর্তনাদ বেরল, 'এত বড় জঙ্গল, সব কেটে ফেলা হবে?'

'সব নয়, খানিকটা । এই মনে করো পর্তুগালের মতো চারটে দেশ জুড়লে যতটা হয়, তার চেয়ে আরেকটু বেশি জায়গার জঙ্গল কাটা হবে ।'

যখন আমার ব্রাজিলে আসা ঠিক হয়ে গিয়েছিল তখন বাবা আমাকে ব্রাজিলের রেইন ফরেস্টের বাংলা শিখিয়ে দিয়েছিলেন— চিরহরিৎ অরণ্য ।

অর্থাৎ ব্রাজিলের এই চিরসবুজ দেশ রেইন ফরেস্টের বাতাস নির্মল, এই বিশাল অরণ্য অফুরন্ত অক্সিজেনের ভাণ্ডার । তা কেটে ফেলা হবে?



আমি ভাবছি দেখে সাহেবটা আমাকে বলল, 'চলো, তোমাকে আমরা রিওয় তোমার কাকার বাড়িতে পৌঁছে দেব । এসো, কপ্টারে উঠে পড়ো, দুদিনেই রিওয় পৌঁছে যাবে । কতদিন জঙ্গলে আছো, তোমাকে রিওয় পৌঁছেই বা তার আগেই মানাউসে ভালো করে ডাক্তার দেখানো দরকার ।' বলে সাহেব আমার জামা-প্যান্টের দিকে তাকাল ।

আরেকজন সেই সাহেবকে বলল, 'ডাক্তার তুমি আরিয়াউতে পৌঁছেই পাবে । আরিয়াউ টাওয়ার্স হোটেলে শুনেছি আমাজনের জঙ্গলের পোকার কামড় থেকে যেসব অসুখ-বিসুখ হয় সেসবের আলাদা ডাক্তার আছে!'

আমি বললাম, 'আমি কয়েক দিন পরে যাব। আরও কয়েকদিন এখানে থেকে যেতে চাই।'

'সে কী! এই ভয়ানক জঙ্গলে জংলী ছাড়া কেউ ইচ্ছে করে থাকে নাকি!'

আরেকজন সাহেব বলল, 'আর য়ু ক্রেজি? আমাদের এই সাহায্যের জন্য তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই সুযোগ আজ হারালে জীবনে আর কোনওদিন তুমি এই জঙ্গল থেকে বেরতে পারবে না। তুমি জানো না, এখানে কী ভয়ানক হিংস্র সব উপজাতি থাকে! ইউ উইল ডাই হিয়ার, মোস্ট পেইনফুলি!' (এই জঙ্গলে তুমি মরে যাবে, খুব কষ্ট পেয়ে পেয়ে মরবে।)

যে আমাকে কোকাকোলা দিয়েছিল, সে হঠাৎ আমার একটা হাত ধরে বলল, 'ডোন্ট বি সিলি, লেটস গো!' (ছেলেমানুষি করো না, এসো, যাওয়া যাক!)

আমি আস্তে করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি আজ যাব না।'

'ইউ মাস্ট গো! অ্যান্ড টুডে!' (তোমাকে যেতেই হবে! আজই!) বলে লম্বা চওড়া চেহারার সাহেব হঠাৎই আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে সবচেয়ে কাছের হেলিকপ্টারের দিকে হনহন করে হাঁটতে লাগল।

আর ঠিক তখনই পাড়ের জঙ্গল ফুঁড়ে বুকে রামধনু আঁকা অনেকগুলো পাখির সুরেলা আর্তনাদ আমার বুকে এসে বিঁধল।

আমি হাত-পা ছুড়ে জোর করে লোকটার দুহাতের বেষ্টনী থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছি, আরেকজন কেউ এসে আমার পা দুটো চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন আমার দুটো হাতও শক্ত করে ধরে রাখল। সেভাবেই আমাকে হেলিকপ্টারে তুলে নিয়ে পাইলট হেলিকপ্টারটাকে আকাশের অনেক উঁচুতে তুলে ফেলল।

আমি উবার একটা ছবি এঁকেছিলাম, সেটা আমার ব্যাগেই রয়ে গেল। উবা আমাকে তাদের দিমানু গোনার কচুরিপানা ফুলের রঙের নটা পাথর দিয়েছিল, সেগুলোও আমার ব্যাগেই পড়ে রইল। পাড়ের জঙ্গল থেকে পাখির সুরে তাদের বিলাপ আমার বুক ভেঙে দিচ্ছে। আমার দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

যে লোকটা আমার হাত প্রায় মুচড়ে ধরেছিল সে হঠাৎ আমার কানের কাছে ঝুঁকে এসে ইংরিজিতে বলল, প্লিজ ফরগিভ আস। আমাদের ক্ষমা করো। তোমার ওপর জোর খাটাতে হল বলে আমরা দুঃখিত। কিন্তু আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য করেছি, সভ্য মানুষের প্রতি সভ্য মানুষের যা কর্তব্য। কোনও সভ্য মানুষ কি জংলীদের সঙ্গে জঙ্গলে থাকতে পারে?

রিও ডি জেনেরোয় পৌঁছে দেখলাম কাকার বাড়ি তালাবন্ধ । শেষ পর্যন্ত হেলিকপ্টারের লোকেরাই পুলিশ ডেকে দরজা খোলার ব্যবস্থা করল । ফাঁকা বাড়ি, যেখানে যেমন দেখে গিয়েছিলাম সব ঠিক তেমনই আছে । তার মানে কাকা আমাজনের জঙ্গল থেকে আর ফিরতে পারেনি ।

আমি যে ঘরটায় থাকতাম, সেই ঘরে ঢুকে দেখলাম টেবিলের ওপর 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ' বইয়ের ভাঁজে আমার প্লেনের টিকিট যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনই গোঁজা রয়েছে ।

পরদিন হেলিকপ্টারের লোকদেরই দুজন আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল ।

কলকাতায় ফিরে আমার সমস্ত মন যেন ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল । এত লোকজন ঘরবাড়ি বাস ট্রাম ঠেলা রিকশার ভিড়ে এখানে কেউ আমরা কারও বন্ধু নই! কেউ আমাকে চেনে না, আমিও কাউকে চিনি না!

ভিড়ের বাসে গুঁতোগুঁতি করে দুবার বাস বদলে আমি বাড়ি পৌঁছে দেখি মা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন ।

আমি প্রায় দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম । মাও আমাকে শক্ত করে ধরে রেখে বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো! একটা চিঠি নেই, খবর নেই, তোর কাকার বাড়িতে ফোন করলে কেউ ফোন তোলে না, মা-বাবার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলি বাবা?'

'বাবা কোথায়?'

'আর বলিস না । সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত থানা-পুলিশ, পুলিশের বড়কর্তা, মেজকর্তা, মন্ত্রী —কার কাছে যেতে বাকি রাখছেন?'

একটু থেমে মা আবার বললেন, 'তোর সত্যি কী হয়েছিল বল তো । হারিয়ে-টারিয়ে গিয়েছিলি নাকি?'

আমার তখন উবার কথা, উবাদের গ্রামের কথা, আমাজন নদীর কথা, আকাশ-ঢাকা জঙ্গলের কথা মনে পড়ে গিয়ে দুচোখ ঝাপসা হয়ে গেছে, ভিজে চোখেই মার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি উবাদের গ্রামে যাব মা, তুমি যাবে আমার সঙ্গে, আমাজনের জঙ্গলে?'

সন্ধেবেলা বাবা বাড়িতে ঢুকেই আমাকে দেখে আনন্দে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন— 'ফিরলি? তুই ফিরেছিস? ও ভগবান!'

আমার কাছে এসে আমাকে কাঁদতে দেখে আবার বললেন, 'কী হল? তোর কী হয়েছে? কী হয়েছিল বল তো! তোরা কোনও বিপদে পড়েছিলি নাকি? একটা খবর নেই, কিছু

নেই, তোর কাকাও কিছু জানাল না! যাক, শেষ পর্যন্ত বেঁচে ফিরেছিস, এই আমাদের ভাগ্য! এখন বল তো, ঠিক কী হয়েছিল? ফিরতে কেন এত দেরি হল?’

আমাজনের জঙ্গলে আমাদের হারিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে একা রিও ডি জেনেরোয় ফিরে আসা পর্যন্ত সব ঘটনার কথা শুনতে শুনতে মা’র দুচোখের জল আর থামতে চায় না । ‘ও! কী কষ্টই না সয়েছিস! কত কষ্ট পেয়েছিস! তোর কাকার যে কোথায় কীভাবে কাটছে’ —বলতে বলতে যতই মা চোখ মোছেন, ততই আবার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে ।

বাবা আর সহ্য করতে না পেরে দুঃখে রাগে হতাশায় বলে উঠলেন, ‘ও চিরকালই গোঁয়ার । আর তেমনই লোভী! বহরমপুরে একবার জাল ওষুধ বিক্রি করে পুলিশের হাতে পড়েছিল । এত দিনেও ওর টাকার লোভ আর গেল না । কোথায় ওর খোঁজ করব, কী করব, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না । কী সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে আছে, কত কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাও তো যায় না! তুই কী বলিস?’

‘আমার মনে হয় আমাজনে গিয়ে যেভাবেই হোক কাকাকে খুঁজে বের করা দরকার । আমি ঠিক পারব ।’

‘দূর পাগল! তোকে আর যেতে দিই?’ মায়ের এই কথায় বাবাও সায় দিয়ে বললেন, ‘তুই কি সত্যিই পাগল হলি?’

আমি এবার বেশ জোর দিয়েই বললাম, ‘উবাদের সাহায্য নিয়ে আমি একাই কাকার খোঁজ করতে পারি । উবারা আমাজনের সব জানে, ওরা তো আমাজনেরই মানুষ!’

‘থাম তো!’ বলে মা আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন ।

বাবা বললেন, ‘কথাটা আর ভুলেও ভাববে না । মনে থাকে যেন ।’